সুমন্ত আসলাম

বাপ্পী ভয়ঙ্কর

রন্টু, তপু, ইন্দ্র, চপল আর রুপম হচ্ছে বন্ধু। বাপ্পী হচ্ছে ওদের নতুন বন্ধু। সান্টুদের বাড়ির ছাদে বসে আছে ওরা। বাড়িটা অবশ্য পুরনো। এক সময় এটা জমিদার বাড়ি ছিল, এখন সান্টুদের। বাড়িটা বেশ চুপচাপ, সন্ধ্যার দিকে আরো নীরব হয়ে যায়। ওরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে এখানে। বাপ্পীর জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। বাপ্পীর আসার কথা ছিল, আসেনি এখনো, আসবে বলেও মনে হয় না। অথচ ওকে খুব জরুরি দরকার। না আসলে বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়ে যাবে আজ।

না, বাপ্পী আর আসে না। ওদিকে ওদের খেলার মাঠ দখল করে ঘর তুলেছে মোখলেস ব্যাপারী। রাতের আঁধারে ঘরটাতে আগুন দিয়ে পুড়ে দিতে হবে। এর আগে আরো অনেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছে ওরা, প্রতিরোধও করেছে। মোখলেস ব্যাপারী সরকারি মাঠ দখল করেছে, মোট কথা এলাকার একমাত্র খেলার মাঠ দখল করেছে। কিন্তু এ ঘরটাতে আগুন দেওয়ার কথা বাপ্পীর, সেই বাপ্পীরই কোনো খোঁজ নেই।

আরেকটা সমস্যা হয়ে গেছে এলাকায়। প্রতিদিন নদীতে লাশ ভেসে আসছে। কারা যেন রাতের আধাঁরে ঘুরে বেড়ায়? অন্যরকম একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকায়। এর মাঝেও বাপ্পীর দেখা নেই।

অবশেষে একদিন পাওয়া যায় বাপ্পীকে। অবাক হয়ে যায় রন্টু, তপু, ইন্দ্র, চপল, রুপম, সান্টু। চুপিচুপি বাপ্পী এত বড় কাজ করেছে!
একেবারে ভয়ঙ্কর কাজ!

সুমন্ত আসলাম

বাপ্পী ভয়ঙ্কর

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com

একসঙ্গে কাজ করতাম আমরা একসময়—কথা হতো আমাদের, আনন্দ হতো আমাদের, হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক; স-বই হতো, হতো মান-অভিমানও। মানুষের জীবন হচ্ছে নদীর মতো, নদীর পানির মতো। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বয়ে যাওয়া, কিন্তু একাকার হয়ে মিশে থাকা। আমরাও তেমন; এখন, আগামীতেও।

প্রিয় শামীম, প্রিয় শামীম শাহেদ

খুব দ্রুত মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন, খুব সুন্দর করে হেসে সুন্দর করে কথা বলারও। আত্মার বলিষ্ঠতা না থাকলে এত আত্মিক হওয়া যায় না।

সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যাও, পরিশ্রম করো। যেটা তোমার আয়ত্তের বাইরে সেটার পেছনে কঠিন পরিশ্রম করে লাভ নেই। যতটুকু তোমার পক্ষে সম্ভব, তা-ই করবে। তবেই তুমি সফল হবে।

–আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার

০১.

রন্টু, তপু, ইন্দ্র, চপল আর রুপম দাঁড়িয়ে আছে সান্টুদের বাড়ির ছাদে। বাড়িটা অবশ্য পুরনো। এক সময় এটা জমিদার বাড়ি ছিল, এখন সান্টুদের। বাড়িটা বেশ চুপচাপ, সন্ধ্যার দিকে আরো নীরব হয়ে যায়। ওরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে এখানে। বাপ্পীর জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। বাপ্পীর আসার কথা ছিল, আসেনি এখনো, আসবে বলেও মনে হয় না। অথচ ওকে খুব জরুরি দরকার। না আসলে বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়ে যাবে আজ।

ছাদের বাম পাশের রেলিংয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে রুন্টু। ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছে ও। চিন্তা করছে গভীরভাবে। একটু অসাবধান হলেই যে দোতালার ছাদ থেকে একেবারে নিচে পড়ে যাবে সেদিকে খেয়াল নেই ওর। অবশ্য পড়ার কথাও না, ও যা সাহসী ! আর পড়লেও ওর কিছু হবে বলে মনে হয় না। কারণ এ পর্যন্ত ও তিন তিনবার উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেছে।

রন্টু প্রথমবার পড়ে গিয়েছিলে রুপমদের বড় পেঁয়ারা গাছটা থেকে। খুব আনন্দ নিয়ে গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডালে গিয়ে পেঁয়ারা পাড়ছিল ও। আস্তে আস্তে উপরে উঠতেই হঠাৎ চোখ চলে যায় সবচেয়ে উপরের ডালটাতে, মস্ত বড় একটা ডাসা পেঁয়ারা ঝুলে আছে সেখানে। অত বড় একটা টসটসে পেঁয়ারার লোভে কিছুটা দ্রুত গতিতে উপরে উঠছিল ও। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে কয়েকটা ডাল, ওরকম একটা ভেজা ডালে পা দিতেই ফসকে যায় ও। পাশের একটা ডাল জাপটে ধরার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু সেটা আর ধরা হয় না, সুড়ৎ করে নিচে পড়ে যায় ও। পেঁয়ারা গাছের নিচে একটা কোদাল রাখা ছিল, অল্পের জন্য ঠিক তার ওপর পড়ে না, পাশের নরম মাটিতে ধপাস একটা শব্দ হয়। সেই

শব্দে বাড়ির সবাই দৌড়ে এসে দেখে মাটির ওপর একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে রন্টু। রুপমের বাবা আহা আহা করে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'এটা কীভাবে হলো! এই কে আছিস, রিকশা ডাক, হাসপাতালে নিতে হবে ছেলেটাকে।' রুপমের মা দৌড়ে গিয়ে এক জগ পানি এনে ঢেলে দেন ওর মুখের ওপর, কিন্তু ও শুয়ে থাকে আগের মতোই। আশপাশের সবার চোখ বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এ মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না কেউ।

রুপমের বড় বোন সাদিয়া আপু সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে পড়েন, ছুটিতে এসেছেন। পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। শোরগোল শুনে বাড়িতে ফিরে পেঁয়ারা গাছের কাছে দৌড়ে চলে আসেন। সবাইকে দূরে দাঁড়াতে বলে রন্টুর একটা হাত টেনে নেন। কবজির কাছে দু আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখেন কিছুক্ষণ। একটু পর পিটপিট করে তাকিয়ে রন্টু বলে, 'আমি তো অজ্ঞান হয়ে যাইনি।'

সাদিয়া আপু অবাক হয়ে বলেন, 'তাহলে!'

'আমি আসলে একটা জিনিস পরীক্ষা করছিলাম।' মাটি থেকে উঠে বসতে বসতে বলে রন্টু।

'কী পরীক্ষা করছিলে?'

'আমাদের বাংলা স্যার প্রতিদিন ক্লাসে এসে বলেন, পৃথিবী থেকে নাকি ভালোবাসা, মায়া-মহব্বত সব উঠে গেছে, এখন আর এসব নেই। তাই গাছ থেকে ইচ্ছে করে পড়ে গিয়ে দেখলাম, সত্যি সত্যি ভালোবাসা-মায়া-মহব্বত আছে কিনা।' শরীর থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রন্টু বলল।'

'তা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কী বুঝলে?'

'বুঝলাম, স্যারের কথা ঠিক না। এখনো পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণ ভালোবাসা আছে। না হলে আমি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এভাবে দৌড়ে আসবেন কেন? খালাম্মা পানি এনে আমার চোখে-মুখে ছিটিয়ে দেবেন কেন, আঙ্কেল আমাকে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য এতো ব্যস্ত হবেন কেন?' রন্টু সাদিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'ভিজিটের কোনো কারবার নেই জেনেও আপনি যেভাবে আমার হাত ধরে পালস দেখলেন, এটাকে কী বলব আপু?'

'কারো পালস দেখলেই বুঝি ভিজিট নিতে হয়?'

'ডাক্তাররা তো তাই করে। আমাদের পাড়ার বক্কার ডাক্তার ডাক্তারি পাশ করেন নাই, অনেক দিন কম্পাউন্ডার ছিলেন, এখন সবাই তাকে ডাক্তার বলে। তার কাছে কেউ গেলেই আগে পঞ্চাশ টাকা ভিজিট দিতে হয়।'

রন্টু দ্বিতীয়বার পড়ে গিয়েছিল তপুদের নতুন একতলা বাড়ির ছাদ থেকে, তৃতীয়বার পড়ে গিয়েছিল ব্রিজের রেলিং থেকে, যদিও সেবার মাটিতে পড়েনি, পানিতে পড়েছিল।

রেলিংয়ের ওপর দু পা তুলে বসল রন্টু। তাই দেখে চোখ বড় করে চপল বলল, 'রন্টু, পা নামা!'

রন্টু পা না নামিয়ে বলল, 'পা না নামালে কী হবে?'

'পড়ে যাবি তো!'

'পড়ে গেলে আর কী হবে, এ পর্যন্ত তিনবার পড়েছি না!' রন্টু পা দুটো আরো ভালো করে তুলে বলল, 'বাপ্পী আসছে না কেন বল তো?'

'আমারও তো একই কথা।' চপল বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল। ও অবশ্য সব বিষয়েই সিরিয়াস। কয়েকদিন আগে ওদের বাড়ির একটা মুরগি কেমন যেন করছিল। সারাক্ষণ বসে বসে ঝিমায়, কিছু তো খায়ই না, হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ও ভেবেছে জ্বর হয়েছে। বেশ কয়েকটা ডাক্তার আছে ওদের এলাকায়, ও তাদের কাছে মুরগিটা না নিয়ে গিয়ে পাশের এলাকায় বড় একটা ডাক্তার এসেছেন তার কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার সাহেব তো মুরগি দেখে অবাক। কিছুটা বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন, 'আমি তো পশু ডাক্তার না, মানুষের ডাক্তার।'

'পশুরা তো মানুষের মতোই। মুরগিরও একটা মাথা, আপনারও একটা মাথা; ওরও দুটো চোখ, আপনারও; ওর একটা নাক, দুটো কান, একটা কলিজা, একটা পেট, মানুষেরও তাই। অবশ্য একটা জিনিস পার্থক্য আছে।'

ডাক্তার সাহেব আগ্রহ নিয়ে বলেন, 'কী?'

'মানুষের দুটো হাত আছে, মুরগির একটাও নাই।' চপল মুখে দুষ্ট দুষ্ট হাসি এনে বলে, 'আরো একটা পার্থক্য আছে।'

ডাক্তার সাহেব আগের মতোই আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'কী?'

'মানুষ বাথরুম করার পর শুচু করে, মুরগিরা করে না।' চপল একটু থেমে বলে, 'করবে কীভাবে, ওদের তো হাতই নেই।'

বেশ কিছুক্ষণ চপলের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার সাহেব বলেন, 'তোমার হাতের মুরগিটার দাম কত?'

'কত আর হবে-দুই শ আড়াইশ হবে।'

'আমার ভিজিট কত জানো?'

'তিনশ।'

'দুইশ আড়াইশ টাকার একটা মুরগির জন্য তিনশ টাকা খরচ করবে, তারপর ওষুধ কেনার জন্য আরো কিছু খরচ হবে।'

'আংকেল, একটা মানুষের দাম কত?'

'মানুষের আবার দাম আছে নাকি?'

'তার মানে আপনারও দাম নাই। এখন আপনার যদি ক্যান্সার হয়, তার জন্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়, সেটা কি ঠিক হবে?' চপল ওর হাতের মুরগিটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'মানুষ আর মুরগির মধ্যে আরো একটা পার্থক্য আছে। মানুষ তার শরীর ঠিক রাখার জন্য ডিম খায়, কিন্তু মুরগি তার শরীর ঠিক রাখার মানুষের বাচ্চাকে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খায় না।'

অবাক হয়ে বেশ কিছু কিছুক্ষণ চপলের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার সাহেব ওর মুরগিটাকে দেখে দেন। চপল ওর পকেট থেকে টাকা বের করে ভিজিট দিতে নিতেই ডাক্তার সাহেব বলেন, 'তুমি খুব ইনটিলিজেন্ট ছেলে। আই লাইক দ্যাট টাইপ অফ ইনটিলিজেন্ট বয়। এর জন্য আমি কোনো ভিজিট নেব না তোমার কাছে থেকে।'

চপল বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে ইনটিলিজেন্ট হচ্ছে রুপম। কিন্তু ক্লাসে ও কখনো প্রথম হয় না। ক্লাস থ্রিতে প্রথম হয়েছিল ও একবার। সাধারণত ক্লাসের ফার্স্ট বয় ক্লাস ক্যাপ্টেন হয়, ওকেও ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছিল তখন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভালো আগেনি ওর। মানুষ স্কুলে আসে লেখাপড়া করার জন্য, মাতব্বরি করার জন্য নয় । ক্লাস ক্যাপ্টেন মানে অযথা মাতব্বরি করা। তাছাড়া ওর ধারনা ক্লাস ক্যাপ্টেনকে সবাই পছন্দ করে না। ও ইচ্ছে করে তাই প্রথম হয় না কখনো ক্লাসে। অবশ্য ক্লাস ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষায় আবার প্রথম হয়েছিল ও। সোহেল নামে নতুন একটা ছেলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হয়ে ফার্স্ট হয়ে গেল হঠাৎ। ক্লাস ফাইভে ক্যাপ্টেন তখন সে। একদিন বেশ দাপট নিয়ে বলেছিল, এ স্কুলে সে

যতদিন থাকবে ততদিন সে ফার্স্ট হবে, কেউ তাকে হারাতে পারবে না। ক্লাস ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষায় রুপম তাকে ঠিকই হারিয়ে দিয়েছিল। তবে একটা কথা রুপম প্রায়ই বলে, আগামী বছর অষ্টম শ্রেণীর স্কুল সমাপনী পরীক্ষায় ও ঠিকই সবার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে।

ছাদে একটা ভাঙা টুলের মতো আছে, রুপম সেখানে বসে বলল, 'আমরা বরং বাপ্পীর জন্য আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

'শালা, আমাদের ফাঁকি দিল না তো?' তপু কথাটা বলে একদলা থুতু ফেলল। তপুর অভ্যাসই হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর থুতু ফেলা। রন্টু তো প্রায়ই বলে, তপু যেভাবে থুতু ফেলে ওর পেট মনে হয় কৃমির অভয়ারন্য। ওর পেটের সবগুলো কৃমি বের করলে কমপক্ষে এক মণ ওজন হবে। তপু তাই শুনে বলে, 'আমার ওজন তাহলে দুই কেজি, না?'

'দুই কেজি হতে যাবে কেন?'

'আমার ওজন মাপলাম সেদিন, বিয়াল্লিশ কেজি। সবগুলো কৃমির ওজন এক মণ হলে বাকী থাকে কত?' তপু রন্টুর দিকে তাকায়।

'এখন এসব থাক। আজ যদি বাপ্পী না আসে কাজটা তাহলে আমি করব।' ইন্দ্র বেশ সাহস নিয়ে বলে। ইন্দ্র অবশ্য বেশ সাহসীও। একদিন ও স্বপ্ন দেখে ওর ঠাকুর দা শ্মশানে বসে কাঁদছে। ঠাকুর দাকে খুব ভালোবাসত ও। তিনি মারা যাওয়ার পর শোকে-দুঃখে তিন দিন না খেয়েছিল ও। ঠাকুর দাকে ওভাবে স্বপ্নে কাঁদতে দেখে ও চুপি চুপি বাসা থেকে বের হয়ে যায়। রাত তখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট। মনটা কেমন যেন করে ওঠে ওর। ঠাকুর দা তো মারা গেছেন, স্বর্গে আছেন এখন। তাহলে ওখানে বসে কাঁদছেন কেন? দ্রুত শ্মশানে গিয়ে ইন্দ্র দেখে, ঠাকুর দা ঠিকই পাকুড় গাছতলায় বসে আছে, স্বপ্নে সে এখানেই বসে থাকতে দেখেছে তাকে। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'ঠাকুর দা, তুমি কাঁদছ কেন?'

খুক করে একটু কেশে ঠাকুর দা বললেন, 'কই আমি কাঁদছি!'

'আমি স্বপ্ন দেখলাম যে।'

'কী স্বপ্ন দেখেছিস?'

দেখলাম শ্মশানের এই পাকুড় গাছতলায় তুমি বসে আছো, আর গুন গুন করে কাঁদছ।' ইন্দ্র আরো একটু এগিয়ে গেল।

'তুই স্বপ্ন দেখেই এখানে চলে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর ভয় করল না?'

'ভয় করবে কেন, তুমি আছো না। তুমি কাঁদছ আর আমি না এসে পারি।' ইন্দ্র খুব নরম গলায় বলল, 'তোমার কথা মনে হলে আমার মাথা ঠিক থাকে না ঠাকুর দা।'

'তুই আমাকে এত ভালোবাসিস।' দু হাত সামনে বাড়িয়ে ঠাকুর দা বলেন, 'আয়, আমার বুকে আয়।'

ঠাকুর দার বাড়ানো হাতের দিকে এগিয়ে যায় ইন্দ্র। অন্ধকারে এতক্ষণ ভালো করে তার মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। চাঁদটা এতক্ষণ মেঘে ঢেকে ছিল, সেটা হঠাৎ বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে ইন্দ্র। ওটা তো ঠাকুর দা না। ঠাকুর দা তো ওভাবে নোংরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে থাকত না। ইন্দ্র থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমি কি সত্যি ঠাকুর দা?'

'কেন তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'ঠাকুর দা হলে তোমার মুখ থেকে কাপড় সরাও।'

'না, কাপড় সরাব না। অসুবিধা আছে।'

'কীসের অসুবিধা?'

'সেটা বলা যাবে না তোকে।'

কান দুটো একটু সজাগ করে ইন্দ্র। না, ওটা তোর ঠাকুর দার গলা না। ঠাকুর দার গলার স্বর তো ওরকম ফ্যাসফ্যাসে শোনাত না। ইন্দ্র সাহস করে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'সত্যি করে বলো তো তুমি কে?'

'অতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিস কেন, কাছে এসে দেখ আমি কে?'

লম্বা একটা ছুরি আছে ইন্দ্রর। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বুদ্ধি করে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। কোমরের কাছে গুঁজে রেখেছে ওটা। দ্রুত ওটা হাতে নিয়ে বেশ শব্দ করে বলে, 'বলো তুমি কে, না হলে এই ছুরি দিয়ে পেট...।' কথাটা শেষ করতে পারল না ইন্দ্র। তার আগেই পাকুড় গাছের নিচে বসে থাকা লোকটা হঠাৎ দৌড়াতে লাগল। পিছু পিছু ইন্দ্রও দৌড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর সামনে তাকিয়ে দেখে লোকটা উধাও, একেবারে ভ্যানিস হয়ে গেছে। ইন্দ্র সেদিন সারা রাত লোকটাকে আবার দেখার জন্য শ্মশানে বসে ছিল। অবশ্য পরে আর দেখা যায়নি তাকে।

ছাদের সিঁড়ির কাছে শব্দ হতেই সবাই ফিরে তাকাল ওদিকে। সান্টুর মা একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডিস হাতে নিয়ে ছাদে এসে বললেন, 'তোমরা সেই কখন থেকে বসে আছো! সান্টু ওর খালার বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছে, একটু পরেই এসে যাবে। তোমাদের জন্য চানাচুর দিয়ে মুড়ি বানিয়ে এনেছি। আচ্ছা, তোমরা কি চা খাবে?'

'আমরা তো চা খাই না, আন্টি।' রন্টু রেলিং থেকে পা নামিয়ে বলল।

'চা না খাওয়াই ভালো। চা বড়দের খাওয়ার জিনিস।' সান্টুর মা চলে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'একটা খবর শুনেছো তোমরা?'

'কী খবর, আন্টি?'

'পশ্চিম পাড়ায় একটা শ্মশান আছে না?'

'জি মাসী, আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে।' ইন্দ্র খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কেন, কী হয়েছে মাসী?'

'শ্মশানের পাশে যে নদীটা আছে সেখানে নাকি একটা লাশ ভেসে আছে। সান্টুর বাবা একটু আগে দেখে এসেছে।'

'লাশটা কার, চিনতে পেরেছে নাকি কেউ?' চপল খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'কয়েকদিন আগেও ওখান দিয়ে একটা লাশ ভেসে যেতে দেখেছে অনেকে। লাশটার গায়ে নাকি কোনো কাপড়-চোপড় ছিল না।'

'কয়েকদিন আর শ্মশানের দিকে খেলতে যেও না তোমরা।' দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে চলে যান সান্টুর মা। রন্টু আবার রেলিংয়ের ওপর দু পা তুলে বসে। তারপর বিরক্তি নিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় না বাপ্পী আজ আসবে।'

'আচ্ছা, নতুন সে স্কুলটা হয়েছে বাপ্পী তো বোধহয় সেখানে পড়ে। তাই না?' রুপম সবার দিকে তাকিয়ে বলে।

'হ্যাঁ।

'আমরা একেকজন তো একেক স্কুলে পড়ি, নতুন স্কুলটার কাছাকাছি আমাদের কার স্কুল?' কথাটা শেষ করে থুতু ফেলে তপু।

'আমাদের কারোরই না।' ইন্দ্র হেঁটে ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়, চল না, আমরা সবাই মিলে বাপ্পীর বাসা থেকে ঘুরে আসি।'

'এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই সময় ওর বাসায় যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা বরং কালকে যাই।' রুপম কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলে, 'ওর তো সমস্যাও থাকতে পারে। কাল বিকেলে সবাই মিলে ওর বাসায় গেলেই সব জানা যাবে।'

'কিন্তু আজ রাতে যে ওর মোখলেস ব্যাপারীর ঘরটাতে আগুন দেওয়ার কথা ছিল, সেটা এখন কে দেবে?' রন্টু বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলে।

'আমি দেব।' নিজের বুকের ওপর নিজেই চটাং করে একটা থাপ্পড় মেরে ইন্দ্র বলে, 'আজ রাতে ওই ঘর পুড়ে ছাই না করা পর্যন্ত আমার ঘুম হবে না। ঘরটা আমাদের পোড়াতেই হবে এবং আজ রাতেই।'

০২.

বাপ্পী বেশ চিৎকার করে বলল, 'আব্বু, তুমি এভাবে গম্ভীর হয়ে আছো কেন বলো তো! আমি এমন কি করেছি যে তোমরা কেউই আমার সঙ্গে তেমন ভালো করে কথা বলছ না।'

অফিস থেকে ফিরে পেপার পড়ছিলেন শাহরিয়ার সাহেব। বাপ্পীর কথার কোনো জবাব দিলেন না। আগের মতোই মনোযোগ দিয়ে পেপার পড়তে লাগলেন তিনি। একটু পর পর পাশের ছোট টেবিল থেকে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমক দিয়ে আবার রেখে দিচ্ছেন। বাপ্পীর ভীষণ রাগ হলো, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আব্বু, তুমি কিন্তু আমার কথার কোনো জবাব দিচ্ছো না!'

শাহরিয়ার সাহেব এবারও কোনো কথা বললেন না, গম্ভীর মুখে পেপার পড়তে লাগলেন। এরই মাঝে পাশের ঘরে মোবাইলটা বেজে উঠল, কিন্তু সেটা আনার জন্য উঠে দাঁড়ালেন না তিনি। বাপ্পীর আম্মু মোবাইলটা এনে বললেন, 'ফোন বাজে তো তোমার।'

'বাজুক।'

'রিসিভ করবে না?'

'ভাল্‌লাগছে না।'

'কোনো জরুরি ফোনও তো হতে পারে।'

'ভাল্‌লাগে না এসব ফোন-টোন আর।' শাহরিয়ার সাহেব কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'দেখো তো কে করেছে?'

'কোনো নাম নেই, নাম্বার উঠেছে।'

'থাক, তাহলে আর রিসিভ করার দরকার নেই।' পেপারের পাতা

উল্টাতে উল্টাতে শাহরিয়ার সাহেব বললেন, 'তুমি বরং আরেক কাপ চা দাও আমাকে, মাথাটা টনটন করছে।'

রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন বাপ্পীর আম্মু। বাপ্পী কিছুটা রূঢ় গলায় বলল, 'আম্মু, বাবা কিন্তু আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলছে না, তুমিও না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তোমরা এরকম করছ কেন? আমার দোষটা আসলে কোথায়?'

বাপ্পীর আম্মু ঘুরে দাঁড়ালেন। একটু এগিয়ে এসে বাপ্পীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাংলা ২য় পত্র, অঙ্ক আর ধর্ম সাবজেক্টে ফেইল করেছে কে?'

'আমি করেছি। এতে গম্ভীর হওয়ার কী আছে, আম্মু!' বাপ্পী এবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? রেজাল্ট দিয়েছে সকাল এগারোটায়, তুমি স্কুল থেকে বাসায় এসেছ বিকাল চারটায় আর এখন বাজে রাত আটটা। তুমি নিজেই তো তোমার রেজাল্টের কথা বলতে পারতে।' আম্মু

খুব মন খারাপ করে বলেন।

'আমি তো জানি, না বললেও আমার রেজাল্টের কথা তোমরা জেনে যাবে। হেডস্যারের সঙ্গে বাবার তো বন্ধুর মতো সম্পর্ক। যা জানানোর হেডস্যারই জানিয়ে দেবেন।'

পেপারটা পাশে রেখে শাহরিয়ার সাহেব বললেন, 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে-সবাই পাশ করেছে, তুমি ফেইল করবে কেন? তাও আবার বেছে বেছে ওই তিনটা সাবজেক্টে!'

'অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ আছে।'

'সেই কারণটা কি?'

মাথাটা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল বাপ্পী। তারপর একবার আম্মুর দিকে একবার আব্বুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাংলা ২য় পত্রে এবার কী রচনা এসেছে জানো? একটি ঝড়ের রাতে, আমার প্রিয় শখ, তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। আমি এ তিনটা রচনার একটাও লিখিনি।'

'কেন?'

'যদি আমি একটি ঝড়ের রাতে রচনাটি লিখতাম তাহলে মিথ্যা লেখা

হতো, কারণ আমি কখনো কোনো ঝড়ের রাত দেখিনি। ছোট খাটো যে দু-একটা ঝড় হয়েছে তা দিনের বেলা হয়েছে। সত্যিকারের ঝড়ের রাত দেখেছে পটুয়াখালী, খুলনা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মানুষজন। আবার বইয়ে লেখা রচনাটি যে লিখব সেটাও মিথ্যা লেখা হবে, ওটা তো আমার দেখা ঝড়ের রাত না, আর যিনি বইয়ে লিখেছেন তার নিজেরও দেখা না। বইয়ে যে ঝড়ের রাতের কথা লেখা হয়েছে তা বানিয়ে বানিয়ে লেখা হয়েছে।'

'তোমার যুক্তি অনুসারে ওটা লিখলে না হয় মিথ্যা লেখা হতো, তাহলে আমার প্রিয় শখ রচনাটা লিখলে না কেন?' বাপ্পীর আম্মু আগের মতোই রাগী রাগী গলায় বললেন।

'আমার প্রিয় শখ কি আমি নিজেই তো সেটা জানি না।'

'তুমি জানো না তোমার প্রিয় শখ কী?'

'জানব কীভাবে-আমার শখের কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে। আমার এখন একটা শখ করে, একটু পর আরেকটা শখ করে। শত শত শখ আমার।' বাপ্পী মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

জেদি গলায় বাপ্পীর আম্মু বলেন, 'শুনি তো দু-একটা শখের কথা।'

'এই যেমন ধরো আমার খুব শখ রাস্তার ধারে বসে মানুষের জুতো সেলাই করব, উন্নতমানের একজন মুচি হবো আমি।'

'মুচি হওয়ার শখ কেন?'

বাপ্পী আম্মুর দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে বলে, 'আম্মু তুমি সেই কখন থেকে গম্ভীর মুখে কথা বলছো! একটু হেসে কথা বললে কী হয়?' বাপ্পী আম্মুর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'মানুষ কোথায় কোথায় জুতো খুলে দাঁড়ায় বলো তো? আগে নাকি কোনো রাজা কিংবা জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জুতো খুলে হাতে করে নিয়ে যেত মানুষ। কোনো পবিত্র স্থানে গেলে মানুষ জুতো খুলে দাঁড়ায়। আরো এক জায়গায় মানুষ জুতো খুলে দাঁড়ায় সেটা হলো মুচির সামনে।' বাপ্পী হাসতে হাসতে বলে, 'কখনো কখনো বাসের ড্রাইভার হতেও ইচ্ছে করে আমার।'

'বাসের ড্রাইভার!' আম্মু কিছুটা চিৎকার করে বলেন।

'হ্যাঁ, বাসের ড্রাইভার। তুমি কি খেয়াল করেছ আম্মু, বাসের ড্রাইভার যখন বাস চালান তখন তার মাঝে কেমন নেতা নেতা একটা ভাব আসে না।

আসবেই তো। তিনি বাস চালান, আর তার পেছনে বসে এবং দাঁড়িয়ে থাকে চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষ, ভালো করে সবার গন্তব্যে পৌঁছানো নির্ভর করে ওই মানুষটার ওপর, কেউ কোথাও নামতে চাইলে সেটাও নির্ভর করে ওনার ওপর। মোট কথা একটা বাসের সব কিছু নির্ভর করে ড্রাইভারের ওপর। এবার তাহলে বোঝো, একটা ড্রাইভারের ক্ষমতা কতটুকু!' বাপ্পী শাহরিয়ার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আব্বু, কিছু বলো।'

পেপার পড়তে পড়তেই শাহরিয়ার সাহেব বললেন, 'কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না, তোমার কথা শুনতে ভালো লাগছে।'

'ভালো তো লাগারই কথা, আমি তো খারাপ কিছু বলছি না। মাঝে মাঝে আমার কৃষক হতেও ইচ্ছে করে। টাকাওয়ালা মানুষরা বেশ অবজ্ঞা করে এই সব সাধারণ মানুষদের। অথচ তারা ফসল না ফলালে না খেয়ে থাকতে হবে সবার। কী অদ্ভুত একটা শক্তি আছে যারা ফসল ফলান। তবে আমার অন্যরকম একটা শখ আছে। মানুষ তো স্ট্যাম্প জমায়, বই জমায়, পুরাতন জিনিসপত্র জমায়, আমারও একটা জিনিস জমানোর খুব শখ। পৃথিবীর যত খারাপ মানুষ আছে তাদের জামা সংগ্রহ করার খুব শখ। ধরা যাক, আমাদের এলাকার এখন সবচেয়ে যে খারাপ সে হলো রিমন। ইভ টিজার হিসেবে পেপারে নাম ছাপা হয়েছে তার। আমার খুব শখ রিমনের একটা জামা সংগ্রহ করে চার রাস্তার মোড়ে টাঙ্গিয়ে রাখব, তারপর সবাইকে বলব তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য ওই জামায় যেন সবাই থুতু ছিটায়। রিমনের জন্য এক ধরনের মানসিক শাস্তি হবে এটা। আব্বু, আইডিয়াটা কেমন বলো তো?'

শাহরিয়ার সাহেব ছোট্ট করে বললেন, 'ভালো।'

'কিন্তু এই ভালো জিনিসটাই পরীক্ষার খাতায় লেখা যাবে না। তোমার প্রিয় শখ কি-পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে আমি মস্ত বড় একটা ফুলের বাগান করব, প্লেনে চড়ে চাঁদে যাব, পাহাড়ের চুড়ায় উঠে পৃথিবীটাকে দেখব। শখের একটা হাইট থাকা উচিত। শখ মানে শখ, প্রিয় একটা ব্যাপার, সেখানে যা-তা নিয়ে লিখলে হবে!' বাপ্পী আব্বুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'আবার তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা রচনাতে কি আমি সেই গরুর কথা লিখতে পারব?'

'কোন গরুর কথা?'

'ওই যে তিন-চার বছর আগে দাদার বাড়িতে যে কোরবানির গরুটা গুতো দিয়ে আমার প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এটা তো একটা স্মরণীয় ঘটনা, কিন্তু পরীক্ষার খাতায় প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলার কথা লিখলে সবাই হাসাহাসি করতে, স্যার ওইটা পড়ে নাম্বার দেওয়া তো দূরের কথা, রাগে খাতা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন।'

'বুঝলাম রচনা লেখোনি তুমি, পত্র তো লিখেছিলে?'

'পত্র লেখার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। আমাদের পরীক্ষায় পত্র এসেছিল-তোমার পরীক্ষার প্রস্তুতি জানিয়ে তোমার বাবার নিকট একটা পত্র লিখো। আচ্ছা আব্বু বলো তো, তোমার কাছে পত্র লেখার কি কোনো প্রয়োজন আছে আমার। তোমার সঙ্গে যেহেতু আমার সকাল বিকাল দেখা হচ্ছে, সেখানে পত্র লেখার দরকার কী? তাছাড়া পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি জানিয়ে পত্র লিখব কেন আমি! প্রস্তুতি তো শেষ, প্রস্তুতি শেষে আমি তো এখন পরীক্ষা দিচ্ছি।'

পেপারটা পাশে রেখে বাপ্পীর দিকে ঘুরে বসলেন শাহরিয়ার সাহেব। বেশ মনোযোগী হয়ে তিনি বললেন, 'বাংলা ২য় পত্রের কথা না হয় বুঝলাম, কিন্তু অঙ্ক কী সমস্যা করল?'

'অঙ্কের সমস্যা আরো ভয়াবহ, আব্বু।' বাপ্পী আব্বুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'তোমাকে একটা অঙ্কের কথা বলি- আতিক সাহেবের মাসিক বেতন ৫৬০০.০০ টাকা। তিনি মাসে ৫০০ টাকা সঞ্চয় করেন। বাকি টাকা ৫:১১:১ অনুপাতে বাড়ি ভাড়া, সংসার খরচ ও ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য খরচ করেন। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য তার মাসিক খরচ কত?' বাপ্পী একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'শিক্ষার মানে হচ্ছে সত্য কিছু শেখা। কিন্তু লেখাপড়া করে মিথ্যা শিখব কেন আমরা?'

'মিথ্যা কোথায় শিখছ?'

'আতিক সাহেবের বেতন ৫৬০০.০০ টাকা। সেখান থেকে সঞ্চয় করেন, ভাড়ি ভাড়া দেন, সংসারের খরচ করেন, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া খরচও দেন। আমাদের ড্রাইভারের বেতন ৮০০০.০০ টাকা। কয়দিন পর পর সংসার চালানোর কথা বলে বেতনের বাইরেও তোমার কাছ থেকে উনি

টাকা নেন। এখন কথা হলো ৮০০০.০০ টাকায় সংসার চালানো যেখানে কঠিন, সেখানে ৫৬০০.০০ টাকায় সংসার চালাবেন কীভাবে আতিক সাহেব? একটা একটা মিথ্যা কথা না? আবার আরেকটা অঙ্ক দেখো-এক দোকানদার প্রতি কেজি ১৮.৫০ টাকা দরে ৮০ কেজি এবং প্রতি কেজি ১৫.০০ টাকা দরে ১০০ কেজি চাল ক্রয় করলেন। ঐ দুই রকমের চাল বিক্রয় করায় তার ১৭০.০০ টাকা লাভ হলো। প্রতি কেজি চাল তিনি গড়ে কত টাকা দরে বিক্রয় করলেন? আব্বু, তুমি বলো তো দেখি ১৫ টাকা কিংবা ১৮ টাকা কেজি চাল কোথায় পাওয়া যায়? মানুষজন ২৪ টাকা কেজি দরে চাল কেনার জন্য খোলাবাজারের লাইনে দাঁড়িয়েও চাল কিনতে পারছেন না, এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর তারা শুনতে পান চালের মজুদ শেষ, সেখানে ১৫ টাকা কেজি চাল, ১৮ টাকা কেজি চাল! অঙ্কে এসব আজগুবি কথা লেখার মানে কী? আরো একটা অঙ্ক শোনো-দুইটি বাস ২০ কিলোমিটার বেগে একই সময়ে গাবতলী বাস ডিপো থেকে আরিচা রওনা হলো। সাভার পৌঁছার পর একটি বাস থেমে গেল, কিন্তু অপর বাসটি চলতে লাগল। আধা ঘণ্টা পর থেমে থাকা বাসটি ঘণ্টায় ২৫ কিলো মিটার বেগে আবার চলতে লাগল। সাভার থেকে কত দূরে বাস দুইটি মিলিত হবে?' বাপ্পী একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'দুইটি বাস একই সময়ে রওনা হলে কখনোই সাভার পৌঁছতে পারবে না। তার আগেই দুটোর যে কোনো অ্যাকসিডেন্ট করে রাস্তার পাশের কোনো খাদে পড়ে যাবে। তুমি দেখোনি, কয়েক মাস আগে আমিন বাজারে একটা বাস রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে পানিতে ডুবে যায়, ৫০ জন যাত্রী মারা যান। আব্বু, সুতরাং এ ধরনের অঙ্ক করতে আমার ভালো লাগে না।'

'অঙ্কের ব্যাপারটাও বুঝলাম, কিন্তু ধর্ম সাবজেক্টে ফেল করার কারণ কী?' শাহরিয়ার সাহেব আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বলেন।

'আমরা নিজের ভাষাই ভালো করে পড়তে-লিখতে পারি না, আরবী ভাষা শিখব কখন?' শাহরিয়ার সাহেবের দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বাপ্পী বলল, 'আব্বু, তোমাদেরও তো ক্লাস সেভেন-এইটে ধর্ম সাবজেক্ট ছিল, অনেক কিছুর আরবী শিখেছ। আচ্ছা বলো তো দেখি-কলমের আরবী কি?'

শাহরিয়ার সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'মনে পড়ছে না।'

'অথচ আমাদের ধর্ম সাবজেক্টে যে কয়টা আরবী শব্দের মানে শিখতে হয় তার মধ্যে কলম একটা। কলমের আরবী হচ্ছে কালামুন।' বাপ্পী খুব আনন্দ নিয়ে বলল, 'ছাত্র জীবনে তুমি যে আরবী শব্দগুলো শিখেছ তোমার এই এখনকার চাকরি জীবনে কোনো কাজে লাগছে কি, আব্বু?'

'না।'

'তাহলে বলো ওই সাবজেক্ট পড়ে লাভইবা কি, পরীক্ষায়ইবা দেব কেন?' বাপ্পী শব্দ করে হেসে উঠে বলে, 'তোমরা অযথা মন খারাপ করে আছো আমার ওপর। মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই। তার চেয়ে তোমাদের দুজনকে একটা ধাঁধা ধরি আমি। আমাদের বিজ্ঞান স্যার প্রায়ই বলেন, জীবনটা হচ্ছে একটা ধাঁধা। সেই ধাঁধাটা ভালো করে শেখা উচিত। বলো তো-কোন জিনিস ডান হাত দিয়ে ধরা যায়, কিন্তু বাম হাত দিয়ে ধরা যায় না?'

বাপ্পীর আব্বু ও আম্মু চুপ হয়ে রইলেন। বাপ্পী আবার হাসতে হাসতে বলল, 'একটু ভাবলেই ধাঁধার উত্তরটা পেয়ে যাবে। আর একটা ভালো জিনিস নিয়ে ভাবলে মনটা ভালো হয়ে যায়।' বাপ্পী চলে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আব্বু, আম্মু, মনটা কি একটু একটু ভালো হচ্ছে?'

০৩.

রন্টুদের বাড়ির পেছনের দেয়ালটা কয়েকদিন আগে সাদা রং করা হয়েছে, কয়লা দিয়ে সেখানে রাক্ষসের মতো একটা ছবি এঁকেছে ইন্দ্র। কিন্তু রাক্ষসের মাথাটা দেখতে অনেকখানি বাপ্পীর মতো। শুধু চোখ আর ঠোঁট একটু অন্যরকম। চোখ দুটো আরো একটু গোল আর ঠোঁট দুটো একটু চিকন হলে হুবহু মিলে যেত বাপ্পীর সঙ্গে।

সান্টু, তপু, রুপম আর চপল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে রাক্ষসটার দিকে। রন্টুদের বাড়ির এই পেছনের জায়গাটায় প্রচুর গাছ। ছায়া আর সবুজে ভরা এই জায়গায় যে-ই আসে সে-ই ভালোবেসে ফেলে। তবে সচরাচর এখানে কেউ আসে না। কেন আসে না এটা কেবল রন্টুর পরিবারের লোকজন জানে, আর কেউ জানে না, রন্টুও জানে না। ইন্দ্র রাক্ষসটার মাথার দু পাশে দুটো শিং আঁকতেই হো হো করে হেসে উঠল সবাই। কিন্তু রন্টু এসে দেয়ালের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে বলল, 'এটা কী করেছিস, ইন্দ্র!'

রাক্ষসটার শিংটা আরো একটু কালো করে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্র। কয়লাটা পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'এমনভাবে চমকে উঠলি যেন দেয়ালে আমি ছবি আঁকিনি, বুলডোজার এনে ভেঙে ফেলেছি দেয়ালটা। আমাদের বাঙালিদের হচ্ছে এই একটা সমস্যা, ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না, প্রতিভারও মূল্য দিতে জানে না। এত ভালো একটা জিনিস আঁকলাম সেটা দেখে প্রশংসা করবি, তা না উল্টো বকঝকা করছিস!'

'বাবা দেখলে আমাকে কি বলবে জানিস?'

'সেটা তো আমার জানার কথা না। তোর বাবা তোকে বলবে, আমাকে তো বলবে না।' রন্টুর হাতের থাল থেকে মুড়ির একটা মোয়া নিয়ে ইন্দ্র বলল, 'যার যার বাবা তার তার সামলানো উচিত।'

'তিনদিন আগে বাবা রং করেছেন দেয়ালটা!'

'তোর বাবা নিজে করেছেন, না মিস্ত্রি দিয়ে করিয়েছেন?'

'বাবা নিজে করতে যাবে কেন, মিস্ত্রি দিয়ে করিয়েছেন।' সকলের দিকে মোয়ার থালাটা এগিয়ে দিতে দিতে রন্টু বলল।

'তাহলে অসুবিধা কি, মিস্ত্রি আবার রং করবে। টাকা-পয়সার যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে বলিস, আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে মিস্ত্রির টাকা যোগাড় করে ফেলব।'

রন্টু রাগী চোখে ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর মোটেই এখানে আঁকা উচিত হয়নি।'

'তুই কি ভালো করে দেখেছিস আমি কি এঁকেছি।'

'কী আর এঁকেছিস, রাক্ষস এঁকেছিস।'

'ভালো করে তাকা, রাক্ষস না কি এঁকেছি দেখ।'

রাগী একটা ভাব নিয়ে রন্টু দেয়ালের দিকে তাকাল। একটু পর মুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠল ওর। দেয়ালের একেবারে কাছে গিয়ে রন্টু বলল, 'বাপ্পী শালাকে এঁকেছিস! খুব ভালো করেছিস। যা, তোকে মাফ করে দিলাম। বাপ্পী-রাক্ষসটাকে দেখে একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

'তার আগে আমার আইডিয়াটা শোন।' ইন্দ্র হাতের মোয়াটাতে আরেকটা কামড় দিয়ে বলল, 'বাপ্পী তো কাল আসেনি। ওর একটা বড় ধরনের শাস্তি পাওনা হয়ে গেছে। কিন্তু ওকে আমরা কবে না কবে পাই। তাই প্রতীকি শাস্তি হিসেবে দেয়ালে আঁকা ওই রাক্ষসটাকে আমরা শাস্তি দিতে পারি। শাস্তিটা অবশ্য অন্যরকম হতে হবে।'

রন্টু সারা মুখে হাসি এনে বলল, 'আমার আইডিয়াটাও এরকম ছিল। কিন্তু কথা হলো শাস্তি হিসেবে আমরা তো রাক্ষসের গালে কষে দুটো করে চড় দিতে পারি না। তাহলে আমরা নিজেরাই ব্যথা পাব।'

'থুতুও ছিটানো যাবে না।' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'হাজার হলেও ও আমাদের বন্ধু। তাই ওর ছবি কিংবা কোনো প্রতিকৃতির ওপর আমরা থুতু ছিটাতে পারি না।'

'একদম ঠিক কথা।' রুপম হাতে মোয়াটায় কামড় দিয়ে বলল, 'গতকাল ও কেন আসেনি আমরা এখনো তা জানি না। তাই ওর ওপর রাগ

করাটাও ঠিক হচ্ছে কি-না বুঝতে পারছি না। তবুও ওর ওপর যেহেতু রাগ হয়েছে শাস্তি তাই ওকে পেতেই হবে। আপাতত এ রাক্ষসটাকে আমরা এমন কিছু করব যাতে বড় কোনো অঘটন না ঘটে আমাদের।'

'আচ্ছা, রাক্ষসটাকে আমরা ভেংচি কাটতে পারি না।' সিরিয়াস ভঙ্গিতে চপল বলল।

'ভেংচি তো মেয়েরা দেয়।' ইন্দ্র কপাল কুঁচকে বলল, 'না, ভেংচি-টেংচি চলবে না। আরো ভালো কিছু শাস্তি দিতে হবে।'

চুপচাপ এতক্ষণ বসেছিল সান্টু। মোয়া হাতে নিয়ে কথা শুনছিল ওদের। একটা কামড়ও দেয়নি তাতে। থালার ভেতর সেটা রেখে দিতেই রন্টু বলল, 'খাবি না?'

'সকাল থেকে দাঁত ব্যথা করছে, খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'দাঁত ব্রাশ করিস না তুই?'

'করব না কেন?'

'তাহলে দাঁত ব্যথা হয় কীভাবে!'

'সেটাই বুঝতে পারছি না।' সান্টু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমরা তো ঢিল মেরে এর ওর গাছের ফল পেড়ে খাই। কিন্তু প্রায়ই ক্ষেত্রে যে ফলটা পাড়তে চাই সেটাতে ঢিল লাগাতে পারি না। আমাদের আশেপাশে অনেকগুলো ইটের টুকরো দেখছি, আমরা এই টুকরোগুলো দিয়ে বাপ্পী-রাক্ষসের নাক বরাবার হাত সই করতে পারি।'

'খুব ভালো আইডিয়া। এতে বাপ্পী-রাক্ষসকে শাস্তিও দেওয়া হবে, আর আমাদের হাত সইও করা হবে।' রন্টু কয়েকটা ইটের টুকরো নিয়ে দেয়াল থেকে দশ-বারো হাত দূরে সরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও ইটের টুকরো হাতে নিয়ে রন্টুর পাশ এসে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রথম ঢিলটা ছোড়ে ইন্দ্র এবং বাপ্পী-রাক্ষসের ঠিক নাকে গিয়ে লাগে সেটা। তারপর একে একে সবাই ঢিল ছুঁড়তে থাকে। ঢিলগুলো এদিক-ওদিক পড়তে থাকে, কখনো কখনো বাপ্পী-রাক্ষসের নাকে লাগে, কিন্তু পঞ্চাশটার মতো ঢিল ছোঁড়ার পরও রন্টু একটা ঢিলও নাকে লাগাতে পারে না। রেগে মেগে শেষে ও বলে, 'তোরা চলে যাওয়ার পর আমি আবার ঢিল ছুঁড়তে থাকব, যদি ওই বদমাসটার নাকে না লাগাতে পারি তাহলে সারারাত ভরে চেষ্টা করব।'

'রাতে তো আরো লাগাতে পারবি না।' ইন্দ্র আরেকটা ঢিল নাকে লাগিয়ে বলে।

'কেন?'

'তখন তো অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'হোক।' রন্টু জেদি গলায় বলে, 'বাসা থেকে চার্জার নিয়ে এসে ঢিলাতে শুরু করব। ঢিলাতে ঢিলাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।'

সান্টু পাশে একটা গাছের গুড়ির ওপর বসে বলল, 'এখন কাজের কথায় আসা যাক। মোখলেস ব্যাপারীর ঘরটাতে বাপ্পীর আগুন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ও আসেনি। ইন্দ্র দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা দিতে দেইনি।'

'ওকে দিতে দেওয়ার তো কথাও না।' তপু পাশে একদলা থুতু ফেলে বলল, 'এ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজ করেছি। চপলদের পুকুর থেকে মাছ চুরি করত উত্তর পাড়ার শফিক, ওকে মেছো-ভূতের ভয় দেখানো হয়েছে। সেদিন মেছো-ভূত সেজেছিল সান্টু।'

গাছের গুড়ি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সান্টু বলে, 'সেদিন রাতে আমার যা কষ্ট হয়েছে! তোরা তো সবাই পুকুর পাড়ের হিজল গাছটার ওপর বসেছিলি। আর আমি ছিলাম পুকরের পানিতে। একটু পর পর কী এসে যেন পায়ে কামড়ায়, বসে থেকেই একেবারে থমকে যাই আমি। আমার দশ হাত সামনে দিয়ে একটা সাপকেও সাঁতরে যেতে দেখি। সাপটা অবশ্য ছোট ছিল, তবুও তো সাপ! ভয়ে গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল আমার। রাত নয়টা বেজে যায়, দশটা বেজে যায়, এগারটা বেজে যায়, চোরা শফিক এল কিনা রাত বারোটায়। আর এসে মাছ ধরার জন্য এমন এক জায়গায় দাঁড়াল আমি তার উল্টো পাড়ে পানির ভেতর বসে আছি।'

'প্রথমে তো তুই ওকে দেখতেই পাসনি।' রন্টু বলল।

'হ্যাঁ। বাপ্পী শিস বাজিয়ে আমাকে ইশারা করে দেখিয়ে দেয় শফিককে। কিন্তু ওপাশে ওকে দেখে আমি তো হতাশ হয়ে যাই। ওপাশে যেতে হলে আমাকে ডুব দিয়ে যেতে হবে। রাত করে পুকুরে ডুব দিয়ে যাওয়া ভয়ের ব্যাপার না।'

'অবশ্যই ভয়ের ব্যাপার।' রুপম ভয় ভয় গলায় বলে, 'সত্যি করে বলতে কি আমি হলে কিন্তু পারতাম না।'

'তবু শফিক চোরাকে ধরার জন্য আমি ডুব দিয়ে শফিকের কাছাকাছি যাই। কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার আগেই পানি নড়ে ওঠে। ও মনে করে বড় একটা মাছ। মাছ ভেবে সরাসরি আমার ওপর জাল ছুড়ে দেয়, তারপর আস্তে আস্তে টানতে থাকে। আমার তো দম আটকে আসার অবস্থা। ও যত আস্তে জাল টানতে থাকে আমি তার চেয়ে বেশি জোরে ওর কাছাকাছি যেতে থাকি। ভাগ্যিস, পুকুরের একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল শফিক। ওর পায়ের কাছে গিয়ে পা দুটো জাপটে ধরি আমি।'

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলে, 'তারপর ওর কি চিৎকার!'

'তারপর দৌড়ে পালানো।' রন্টুও হাসতে থাকে।

'এরপর আমাদের পুকুর থেকে কখনো আর মাছ চুরি হয়নি।' চপল সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঢাকায় সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজে পড়তে যাওয়ার আগে রুপমের সাদিয়া আপুকে আমাদের পাশের গ্রামের একটা ছেলে ডিস্টার্ব করত না, তাকে একাই পিটিয়ে ভর্তা বানিয়েছিল রন্টু।'

'আমি একা না, তোরা সবাই ছিলি।'

'আমরা সব কাজ তো সবাই মিলেই করি। কিন্তু এরই মধ্যে একজন কাজটা প্রথমে শুরু করে। এভাবে আমরা চার রাস্তার মোড়ের নেশাখোরদের তাড়িয়েছি, এ কাজে পুলিশে এনে সাহায্য করেছে রুপম।'

'কারণ থানার ওসি সাহেব হচ্ছে আমার আম্মুর মামা। ওনাকে কথাটা বলতেই উনি ওদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করলেন।' রুপম ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই যে মনি সাঁওতাল, আমাদের সঙ্গে পড়ত, এখন অবশ্য পড়া বাদ দিয়েছে, ওরা না খেয়ে ছিল কয়েকদিন। ব্যাপারটা জানতে পারি আমরা। তখন কি যেন পুজো হচ্ছিল, ইন্দ্র ওদের মন্দির থেকে খাবার চুরি করে এনে মনিদের দিয়েছিল। কয়দিন না খেয়েছিল ওরা, হাপুস-হুপুস করে ওদের খাওয়া দেখে আমাদের সবার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।'

'তবে সবচেয়ে সাহসী কাজ করেছিল চপল।' ইন্দ্র চপলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চার রাস্তার মোড়ে শিকদার চৌধুরী ময়লা ফেলত। গন্ধে সেখান দিয়ে যাওয়া যেত না।'

'আসলে আমিও প্রথমে ব্যাপারটা খেয়াল করিনি। গ্রাম থেকে আমার নানু এসেছিল কয়েকদিন আগে। তাকে নিয়ে ওই চার রাস্তার মোড় দিয়ে

বাজারে যাচ্ছিলাম। দাদু হঠাৎ নাক ঢেকে বলে, এখানে যে ময়লা ফেলে তোরা কিছু বলিস না? ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে যায় আমার। বাসায় ফিরে একা একাই শিকদার সাহেবকে কথাটা বলি। কিন্তু কোনো পাত্তা দেন না তিনি আমাকে। কয়েকদিন এভাবে দেখার পর আমাদের এলাকার আমার বয়সী সবাই মিলে ওই ময়লা তুলে শিকদার সাহেবের বাসার সামনে ফেলে আসি। কাজটা এলাকার সবাই পছন্দ করে ফেলে। শিকদার সাহেব বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ময়লা দেখে চিৎকার করতে থাকেন। একটু পর তিনি খেয়াল করেন, এলাকার সব মানুষ একে এক জড়ো হচ্ছে তার বাসার সামনে, সবাই কেমন যেন প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ তিনি বাসার ভেতর ঢুকে যান আবার।'

'তারপর থেকে তো ওখানে আর ময়লা ফেলেন না তিনি।' ইন্দ্র বলল।

'হ্যাঁ। তারপর থেকেই ময়লা ফেলা বন্ধ।'

'আমাদের এবাবের টার্গেট হচ্ছে মোখলেস ব্যাপারী।' রন্টু শব্দ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমরা যে মাঠে খেলি, ওটা সরকারি মাঠ, ওই ব্যাপারীর বাচ্চা ওখানে একটা ঘর তুলেছে। এমনি খেলাধুলার জায়গা কমে যাচ্ছে আমাদের, তার ওপর দখলদারদের দাপটে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে আমাদের। এটা মেনে নেওয়া যায় না। ওই ঘর আমাদের পুড়ে ফেলতে হবে, আজ রাতেই।'

'তার আগে একটা চিঠি লেখার কথা না?' রুপম পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, 'চিঠিটা আমি লিখে এনেছি।'

'পড় তো দেখি।'

'মোখলেস ব্যাপারী সাহেব-।' রুপম পড়তে থাকে, কিন্তু রন্টু ওকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'সাহেব লিখেছিস কেন, ব্যাপারী আবার সাহেব নাকি?'

'সাহেব লেখাটা তাহলে কেটে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, কেটে দিয়ে আবার পড়।'

রুপম আবার পড়তে লাগল চিঠিটা-

> মোখলেস ব্যাপারী,
> সরকারি জায়গা দখল করে ঘর তুলেছেন আপনি। কাজটা ঠিক হয়নি আপনার। ওখানে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলা করে। তাদের

খেলার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ঘরটা পুড়ে দেওয়া হলো।
আবার যদি ঘর তোলেন, তাহলে আপনার বাড়ির সব ঘর পুড়ে ফেলা হবে। সুতরাং সাবধান!
ইতি জনগণের বন্ধু

রুপমের পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে রন্টু বলল, 'খুবই ভালো লিখেছিস। এখনই চিঠিটা পোস্ট করা দরকার। আজ পোস্ট করলে কাল পেয়ে যাবে ব্যাপারী। তার আগে আর আজ রাতেই ঘরটা পুড়িয়ে দিতে হবে আমাদের।'

'কাজটা তো বাপ্পীর ছিল। কালকের মতো আজকেও বলছি, ও বোধহয় আজও আসবে না, কাজটা তাহলে আমি করব।' ইন্দ্র বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলল।

'তুই একা করবি কেন?' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'আমরা সবাই মিলেই করব।'

'সবাই মিলে ঘরে আগুন দেওয়া যায় না। একা একা গিয়ে চুপচাপ পেট্রোল ঢেলে ম্যাচের একটা কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই ব্যাস।' ইন্দ্র আনন্দের একটা হাসি দিয়ে বলল, 'পেট্রোল তো রুপমের যোগাড় করার কথা।'

'হ্যাঁ, আমি যোগাড় করেছি। গাড়ির কি একটা কাজের জন্য আব্বু একটা গ্যালনে কিছু পেট্রোল এনে রেখেছে বাসায়। ওই গ্যালনটা চুরি করে আমার ঘরে এনে রেখেছি। রাতে ওইটা বাইরে নিয়ে আসব। আচ্ছা-।' রুপম সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাপ্পী কেমন আছে, কেন আসছে না, একটু খবর নেওয়া দরকার না আমাদের?'

'আজ রাতে কাজটা সেরে নেই। তারপর খবর নেব।'

রাত দেড়টার দিকে পেট্রোলের গ্যালনটা নিয়ে ইন্দ্র যখন মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন এলাকার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ ফাঁকে রাস্তার পাশে রন্টুরা দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র ভালো করে দেখে ঘরের চারপাশে পেট্রোল ঢেলে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে দিল। তারপর দৌড়ে চলে এল রন্টুদের কাছে। ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, ঘরটার চারপাশে আগুনে লাল হয়ে গেছে। আস্তে সেই আগুনগুলো উপরের দিকে উঠছে। হঠাৎ মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির ভেতর থেকে 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার শোনা গেল। রন্টু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'চল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। দৌড়ে পালাতে হবে।'

দৌড়াতে শুরু করল সবাই এক সঙ্গে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চার রাস্তার মোড়ের ফাঁকা জায়গাটায় এসে উপস্থিত হলো ওরা। রুপম হঠাৎ ডান পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'পা'টা কেটে গেছে রে।'

'কীভাবে কাটল! জুতো পরিসনি?' সিরিয়াস ভঙ্গিতে চপল বলল।

'দৌড়ানোর সময় একটা খুলে গেছে!'

'ওটা আর তুলে আনিসনি?' সান্টু ভীষণ চমকে উঠে বলল।

'সময় পেলাম কোথায়। ভয়ে ভয়ে এমন দৌড় দিলাম, পেছনে আর তাকাইনি।' রুপম আপরাধী কণ্ঠে বলল।

'সর্বনাশ করেছিস! কাল সকালে কেউ যখন তোর জুতোটা খুঁজে-।' কথাটা শেষ করতে পারল না রন্টু, একটা ঘরের পাশে লুকিয়ে পড়ল সবাই। আগুন লাগার খবর সম্ভবত সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। কারা যেন এদিক দিয়ে মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির দিকে যাচ্ছে. খুব দ্রুত পায়ে যাচ্ছে।

০৪.

সকালে ঘুম থেকে উঠেই রুপমের মনে হলো-তার দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে সবাই, কিছুটা আড়চোখে তাকাচ্ছে। কিন্তু ও তাকালেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সবাই। তার আরো মনে হলো-তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মুচকি মুচকি হাসছেও সবাই। বেশ চিন্তায় পড়ে গেল রুপম। রাতে যে মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে তা কি সবাই টের পেয়ে গেছে! কিন্তু টের পাওয়ার তো কথা না কারো!

বাথরুম ঢুকতে নিতেই রুপম খেয়াল করল, তাদের কাজের ছোট ছেলেটা তাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। বাথরুমে না ঢুকে ঘুরে দাঁড়াল রুপম। কিছুটা রাগী গলায় বলল, 'ওভাবে হাসছিস কেন?'

'আপনাকে দেখে।'

'আমাকে দেখে হাসার কী হলো!'

'পায়জামা উল্টা করে পরেছেন আপনি। ফিতাটাও কুত্তার জিভার মতো ঝুইল্যা আছে।' কাজের ছেলেটা আবারও হাসতে থাকে।

ঝট করে নিচের দিকে তাকিয়ে রুপম দেখে, সত্যি সত্যি সে পাজামা উল্টো করে পরেছে সে, লম্বা ফিতাটাও গিট্টু দেওয়ার পর বাকী অংশটুকু ভেতরে ঢোকায়নি, বাইরে ঝুলে আছে। রাতে বাইরে থেকে এসে দ্রুত কাপড় চেঞ্জ করে ঘুমানোর জন্যই এরকম উল্টা-পাল্টা কাজ হয়েছে। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য রুপম কিছুটা রূঢ় গলায় বলে, 'তোকে না বলেছি সুন্দর করে কথা বলবি, এতদিন তাহলে কী শেখালাম!'

'সুন্দর করেই তো কথা বললাম।'

'কুকুরকে তাহলে কুত্তা বললি কেন?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

রুপম আবার বাথরুমে ঢুকতে যায়। ছেলেটা একটু এগিয়ে এসে বলে, 'আমি একটা জিনিস দেখেছি।'

থমকে দাঁড়ায় রুপম। আলতো করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বলে, 'কী দেখেছিস তুই?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে ছেলেটা বলল, 'রাতে বাইরে গিয়েছিলেন।'

'রাতে আমি বাইরে গিয়েছিলাম, তুই দেখেছিস!'

'জি।'

'কীভাবে দেখেছিস?'

'রাতে তো আমার ঘুম আসে না। আমি তখন বারান্দায় গিয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে ছাদেও যাই।' ছেলেটা হাসতে হাসতে বলে, 'ছাদে গিয়ে হাঁটি আর আকাশের তারা গুনি।'

'তোর ভয় করে না।'

'নাহ্। ছাদে যখন হাঁটি তখন মাথার ওপর চাঁদ থাকে, তারা থাকে। ভয়ের কোনো কারণই নেই। তবে মাঝে মাঝে যে ভয় পাই না, তা না। ছাদে হাঁটার সময় মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন আমার পেছনে পেছনে হাঁটে, খুব নিঃশব্দে হাঁটে। আমি ঘুরে দাঁড়ালেই পেছন থেকে সরে যায় সে।'

রুপম এগিয়ে এসে ছেলেটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'রাতে তোর ঘুম না হওয়ার কারণ কি বল তো?'

দুষ্টমির হাসি দিয়ে ছেলেটি বলে, 'কারণ তো একটা আছেই। একটা না অনেকগুলো আছে। রাত যখন গভীর হয়ে যায় মানুষের আসল কাজ দেখা যায় তখন। আমাদের ডান পাশে তপন ভাইয়াদের বিল্ডিং, রাত হলেই প্রায়ই ওই বিল্ডিংয়ের ছাদে ভাইয়াদের বুড়ো বুয়াটা চলে আসে। এসে কী করে জানেন?'

রুপম খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কী?'

'তার একটা কাপড়ের পোটলা আছে। সেখান থেকে সব জিনিস বের করে একা একাই কার সঙ্গে যেন কথা বলে সে। একটু পর শুরু হয় তার আসল কাজ। আকাশের দিকে দু হাত তুলে গুনগুন করে কাঁদতে থাকে সে। বিশ পঁচিশ মিনিট কাঁদার পর আবার সব জিনিস পোটলায় ভরে নিচে নেমে

যায়। মানুষটার কান্না দেখে খুব মন খারাপ হয়ে যায় আমার।' ছেলেটি একটু থেমে বলে, 'বাম পাশের বিল্ডিংয়ের নিপা আপা কী করে জানেন? ছাদে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কার সঙ্গে যেন কথা বলেন মোবাইলে। কোনো কোনো দিন কথা বলতে বলতে সকাল করে ফেলেন।' ছেলেটি হাসতে হাসতে বলে, 'সবচেয়ে মজার কাজ করেন হাবিব ভাইয়া।'

'কোন হাবিব ভাইয়া?'

'ওই যে পেছনের বিল্ডিংয়ের হাবিব ভাইয়া। মাঝরাতের দিকে ছাদে উঠে এসে তিনি ওপাশের ছাদে প্রশাব করে দেন।'

'ওপাশের ছাদে মানে পিপলুদের ছাদে?'

'হ্যাঁ, পিপলুদের ছাদে।'

'পিপলুদের সঙ্গে তো হাবিব ভাইয়াদের ঝগড়া আছে।'

'প্রতিদিন সকালে দেখেন না পিপলুর বাবা ছাদে কী রকম চিৎকার করে-কে প্রশাব করল, কখন করল, কেন করল। কোনো কোনো দিন আমার ঘুম ভাঙতে চায় না। পিপলুর বাবার চিৎকার শুনে বিছানা থেকে উঠতে হয়।' ছেলেটি রুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাল রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আপনার হাতে কী যেন একটা ছিল। ছাদ থেকে ভালো করে দেখা যায়নি।'

রুপম কিছু বলে না। সোজা বাথরুমে ঢুকে যায় ও। বাথরুমের আয়নার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে সে। মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরে আগুন দিয়ে দৌড়ে আসার সময় গাছের একটা ডাল লেগেছিল কপালে, লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

স্কুল থেকে বিকেলে বাসায় ফিরেই রুপম দেখে তিনজন পুলিশ বসে আছেন ড্রইংরুমে। বুকের ভেতের ধুক করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। রুপমের বাবা আলতাফ সাহেব তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রুপমকে দেখে ড্রইং রুমে ডেকে আনলেন তাকে। তিনজন পুলিশের মধ্যে মোটা পুলিশটি বললেন, 'তুমি কি এই মাত্র স্কুল থেকে আসলে?'

শুকনো গলায় রুপম বলল, 'জ্বি।'

সামনের সোফাটা দেখিয়ে রুপমকে তিনি বললেন, 'ওখানে বসো।

আমরা তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। আশারাখি ঠিক ঠিক উত্তর দেবে তুমি, একদম মিথ্যা কথা বলবে না।'

জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসল রুপম। পায়ের কাছে রাখা ব্যাগ থেকে একটা জুতো বের করে পুলিশটি বললেন, 'এটা কার জুতো, রুপম?'

জুতোটার দিকে ভালো করে তাকাল রুপম। ওকে দেখে মনে হচ্ছে এরবকম জুতো ও কখনো দেখেনি, এই প্রথম দেখছে। পুলিশটি বলল, 'রুপম বলো জুতোটা কার?'

রুপম হালকা গলায় বলল, 'আমার।'

'থ্যাংক ইউ।' জুতো আবার ব্যাগে ভরে পুলিশটি বললেন, 'এবার বলো, তোমার এই জুতোটি চার রাস্তার মোড়ের কাছে রাস্তায় পড়েছিল কেন?'

'সম্ভবত চোর চুরি করে নিয়ে যেতে ফেলে রেখে গেছে।'

'চোর তো কখনো একটা জুতো চুরি করে না, রুপম। চোর করলে এক জোড়া এক সঙ্গে করবে।'

'রাতে চুরি করার সময় চোর ভেবেছিল দুটোই চুরি করেছে সে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর দেখে একটা চুরি করেছে। তাই রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে ওটা।' রুপম ঝটপট বলে ফেলল।

'তুমি তাই মনে করছো?' চোখ দুটো সরু করে বললেন পুলিশটি।

'জ্বি, আমি তাই মনে করছি।'

'কিন্তু এতো কিছু থাকতে চোর শুধু তোমার জুতো চুরি করল কেন?'

'সেটা তো আমি বলতে পারব না, আঙ্কেল। চোরের সঙ্গে তো আমার কথা হয়নি, কথা হলে না হয় জিজ্ঞেস করতে পারতাম।'

পাশে থেকে পেট্রোলের গ্যালনটা বের করে পুলিশটি বললেন, 'এটা কি, বলো তো?'

'গ্যালন।'

'এটাতে কী রাখা হয়?'

'কেউ পানি রাখে, কেউ সরিষার তেল রাখে, কেউ আবার গরুর দুধ রাখে। একেকজন একেকরকম কাজে ব্যবহার করে।' রুপম গ্যালনটার দিকে তাকিয়ে বলল।

'এটার ভেতর তো পেট্রোল রাখে অনেকে।'

'রাখতে পারে।'

'এই গ্যালনটাতে পেট্রোলই ছিল। আর এখানে পেট্রোল রেখেছিলেন তোমার বাবা।' পুলিশটি আলতাফ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আলতাফ সাহেব, কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছেন এটা আপনার গ্যালন, এটাতে পেট্রোল রেখেছিলেন আপনি এবং এটা আপনি আপনার গাড়ি রাখার গ্যারেজের কোনায় রেখেছিলেন।'

'জ্বি।'

পুলিশটি আবার রুপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গ্যারেজে রাখা এই গ্যালনটা মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির কাছে গেল কীভাবে?'

'এটা তো আমার জানার কথা না। তবু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওটা ওই চোরেরই কাজ। ও এখন বুঝতে পারছি-।' রুপম কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলে, ' চোরটা আসলে এই পেট্রোলের গ্যালনটাই চুরি করতে এসেছিল। ওটা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ভুলে আমার একটা স্যান্ডেলও নিয়ে গেছে। পরে ওটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে।'

'এই গ্যালনটাও তো মোখলেশ ব্যাপারীর পোড়া ঘরটার পাশে পড়ে ছিল। চোর চুরি করে নিলে ওখানে পড়ে থাকার কথা না এটা।' পুলিশটি রুপমের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'আঙ্কেল, এ সবই হচ্ছে চোরের ব্যাপার, আমি তো চোর না। আমার তাই এসব জানার কথা না।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে রুপমের দিকে এগিয়ে দিয়ে পুলিশটি বললেন, 'এই চিঠিটা কার হাতের লেখা বলো তো?'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে রুপম বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। তারপর মাথাটা উঁচু-নিচু করতে করতে বলল, 'এটা তো আমার হাতের লেখাই দেখছি। তবে এটা আমি লিখিনি। আজকাল হাতের লেখা নকল করা কোনো ব্যাপার না। আমাদের ক্লাসের পল্টু পরীক্ষায় একবার ফেল করেছিল। মার্কশিট নিয়ে ও ওর বাবার সামনে যেতে ভয় পাচ্ছিল। শেষে ও ওর বাবার সাইন হুবহু নকল করেছিল। ও একবার হেডস্যারের সাইনও নকল করেছিল। সুতরাং সাইন যেহেতু নকল করা যায়, সেহেতু হাতের লেখা নকল করা তো কোনো ব্যাপারই না।'

'কিন্তু এতো মানুষ থাকতে তোমার হাতের লেখা নকল করবে কেন?'

'সেটা যে নকল করেছে তাকে পেলে জিজ্ঞেস করতে পারতাম।'

পুলিশটি বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'আচ্ছা, মোখলেশ ব্যাপারী মানুষটা কেমন?'

'খুবই ভালো মানুষ। তার মতো ভালো মানুষ আমি এ জীবনে দেখিনি। তার ব্যবহার ভালো, কথাবার্তা ভালো। আমাদের দেখলেই হেসে হেসে বলেন, কী খোকা, চকলেট খাবে, কোক খাবে, আইসক্রিম খাবে? মাঝে মাঝে তো উনি জোর করে আমাদের এটা ওটা কিনে দেন।'

'এই ভালো মানুষটার ঘরটা পুড়িয়ে দিল কে বলো তো?'

'মোখলেশ চাচার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে!' চোখ বড় বড় করে রুপম বলল, 'এই জঘন্য কাজটা কে করল? তার মতো ভালো মানুষের এত বড় সর্বনাশ কে করল। খুবই খারাপ কাজ হয়েছে এটা।'

'ঘর পোড়ানোর খবরটা তুমি জানো না?'

'এই তো, এই মাত্র জানলাম।'

'তোমার বয়সী তিন-চারজন ছেলেকে কাল রাতে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেখা গেছে।'

'অবশ্যই দেখা যেতে পারে। এ এলাকায় আমার বয়সী ছেলে আছে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন। তাদের মধ্যে থেকে আট-দশ জন বাইরে বের হতেই পারে।' রুপম মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'আঙ্কেল, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে এসেছেন। চা দিতে বলি?'

'না, চা খাব না আমরা।' পুলিশটি রুপমের দিকে একটু ঝুকে বসে বললেন, 'তোমার কপালে একটা দাগ দেখছি, কীসের দাগ ওটা?'

'কাল রাতে কারেন্ট ছিল না, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম।'

বা হাতের একটা আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে পুলিশটি বললেন, 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'এখনই?'

'জ্বি, এখনই।'

'কোনো সমস্যা নেই, আঙ্কেল। আমি স্কুল ড্রেসটা পাল্টিয়ে নরমাল একটা ড্রেস পের আসছি।' রুপম ভেতরের দিকে যেতে নিতেই বাবার দিকে

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'রিল্যাক্স বাবা, ওভাবে গম্ভীর হয়ে বসে আছো কেন তুমি!'

স্কুল শেষে বাসায় ফিরে সবাই যখন মাঠে এসে বসেছিল, তখন মোখলেশ ব্যাপারীর ছোট ছেলে মৃধা এসে বলল, 'খুব তো আমাদের ঘরটা পুড়ে দিলি তোরা। কিন্তু শাস্তি পাচ্ছে রুপম একা।'

'কী বললি, গাধা!' রন্টু চিৎকার করে বলল। আড়ালে-আড়ালে মৃধাকে ওরা গাধা বলেই ডাকে। এখন প্রকাশ্যেই ডাকল।

'যা, রুপমদের বাড়িতে গিয়ে দেখ।' মৃধা আর কিছু না বলে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে উঠে দাঁড়াল সবাই। একসঙ্গে দৌড়াতে লাগল রুপমদের বাড়ির দিকে।

০৫.

জানালার কাছে চুপচাপ বসে আছে বাপ্পী। ওর দাদুর ঘরের ভেন্টিলেটরে এক জোড়া চড়ুই বাসা বাধছে। কোথা থেকে যেন একটা করে এটা-ওটার কুটো আনছে মুখে, তারপর ভেন্টিলেটরের সামনের কারেন্টের তারে এসে বসছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সাবধান হয়ে একটু পর টুক করে ঢুকে যাচ্ছে ভেন্টিলেটরের ভেতর। কুটোটা রেখে বাইরে চলে আসছে আবার।

কয়দিন ধরে বাসার বাইরে যাচ্ছে না বাপ্পী। বাইরে বের হলেই সবাই জিজ্ঞেস করে রেজাল্ট কী-তিন সাবজেক্টে ফেল করেছে, বার বার এটা বলতে ভালো লাগে না। তাছাড়া বলার পর হাজার রকমের প্রশ্ন-কেন ফেল করা হলো, কোন কোন সাবজেক্টে ফেল করা হলো, কত নম্বরের জন্য ফেল করা হলো। সেইসব বলার পর আবার উপদেশ বিতরণ-পাশ করতে হলে কীভাবে পড়তে হবে, মুখস্থ করার নিয়ম কী, মুখস্থ করার চেয়ে কীভাবে বুঝে পড়তে হয়। উপদেশের পর উপদেশ। বাপ্পী তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী কয়েকদিন সে আর বাসার বাইরে বের হবে না। কিন্তু ও জানে না বাসার সামনে রাস্তার ওপাশে রন্টু চপল, তপু, ইন্দ্র আর সান্টু অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। ওরা প্রায় আধা ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছে।

বাপ্পীরা এখানে এসেছে সাত মাস হলো। এর আগে ওরা নরসিংদীতে ছিল। ওর বাবা শাহরিয়ার সাহেব খুব বড় একজন সরকারি অফিসার। দু-তিন বছর পর পর বদলি হন তিনি। এখানে আসার পর বাপ্পীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওদের, বন্ধুত্বও হয়েছে, কিন্তু ওর বাবাকে কেমন যেন ভয় পায় ওরা। হয়তো অত্যান্ত গম্ভীর চেহারা তার। ঠোঁটের ওপর গোঁফটাও ইয়া মোটা। বাপ্পীর বাবার সঙ্গে ওদের তাই কখনো পরিচয় হয়নি, কথাও হয়নি। ওনাকে

দেখলেই ওরা কেমন দূরে সরে যায়। কিন্তু ওদের আজ শাহরিয়ার সাহেবকে দরকার। ওরা শুনেছে, এ এলাকার পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্চ পদস্থ অনেক সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে ওনার খুব ভালো সম্পর্ক। রুপমকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, ওনাকে বললে উনি একটা কিছু করে দিতে পারেন, পুলিশ তখন ছেড়ে দিতে পারে ওকে। কিন্তু বলা তো দূরের কথা সম্ভবত দেখাই পাওয়া যাবে না তার। আগে তো বাপ্পীর দেখা পেতে হবে, তার পর ওর বাবার।

'আচ্ছা, বাপ্পী হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল, আমাদের সঙ্গে একটু যোগাযোগও করছে না।' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল।

'আমার মনে হয় বড় কোনো সমস্যা হয়েছে ওর।' চপল বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল।

'যতই সমস্যা হোক, তাতে দেখা করতে অসুবিধা কী?' রন্টু কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'সমস্যা ছাড়া মানুষ আছে নাকি। যাদের সমস্যা আছে তারা ওর মতো পালিয়ে আছে নাকি!'

'যত যাই বলিস না কেন বাপ্পী কিন্তু অন্যরকম একটা ছেলে। ছয় সাত মাস আগে আমাদের এলাকায় এসেছে। কিন্তু কীভাবে মিশে গেছে আমাদের সঙ্গে। মনেই হয় না ও আমাদের নতুন বন্ধু। আর ওর বাবা যে এত বড় একজন অফিসার সেটা ওকে দেখে কিন্তু মোটেই টের পাওয়া যায় না।' ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল, 'বিয়ে করে ফেলেছে নাকি ও?'

'বিয়ে করলে তো আমাদের দাওয়াত দিত।' সান্টু খুক করে একটু কেশে বলল, 'আমরা এখানে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছি আর ওদিকে রুপম না জানি কেমন আছে।'

'ওর বাবা তো ওর সঙ্গে গেছেন।' বাপ্পীদের বাসার গেটের দিকে তাকিয়ে রন্টু বলল, 'চল না সাহস করে বাপ্পীদের বাসায় একবার ঢুকে পড়ি। ওর বাবা তো আর বাঘ-ভালুক না যে আমাদের দেখেই হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন।'

'হুঙ্কার দিয়ে না উঠলেও ওর বাবা কিন্তু এখন বাসায়ই আছেন। একটু আগে বাসায় ঢুকতে দেখলাম না আমরা।' সান্টু ঘাসের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাসায় যাওয়া দরকার। কিন্তু রুপমকে রেখে বাসায় যাই কীভাবে?'

'ভালো কথা- ।' রন্টু হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা সবাই মিলে রুপমের ওখানে গেলে কেমন হয়?'

'থানায় গিয়ে কী হবে?' চপলও উঠতে উঠতে বলল।

'যে পুলিশ রুপমকে থানায় নিয়ে গেছেন তাকে গিয়ে বলব, আঙ্কেল, মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরে আমি আগুন দিয়েছি।' রন্টু বলল।

'তুই বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলব, না আঙ্কেল, ঘরে আমি আগুন দিয়েছি।' সান্টু বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলল।

থুতু ফেলতে নিয়ে সেটা গিলে ফেলে তপু বলল, 'না না আঙ্কেল, ঘরে আমি আগুন দিয়েছি। এই যে দেখেন আমার হাতে পোড়া দাগ।' রাতে কারেন্ট ছিল না, অন্ধকারে মোম জ্বালাতে গিয়ে ম্যাচের আগুনে হাতের কবজির কাছে পুড়ে গেছে তপুর। সবাইকে সেটা দেখাল সে।

ইন্দ্র শব্দ করে হাসতে হাসতে বলল, 'আমরা সবাই যদি বলি আমি আগুন দিয়েছি, আমি আগুন দিয়েছি, পুলিশ আঙ্কেল তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবেন। রুপমকে তখন ছেড়েও দিতে পারেন।'

'তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই, এখনই যেতে হবে।' চপল সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কথাগুলো কিন্তু খুব স্মার্টলি বলতে হবে আমাদের।'

'অবশ্যই।' রন্টু মুচকি হেসে বলল, 'কিন্তু সব কথা শুনে আমাদের সবাইকেই যদি রুপমের মতো আটকে রাখে!'

'ব্যাপারটা খারাপ হবে না। একদিন তো একদিন আমাদের ছাড়তেই হবে। রাজনীতিবিদদের মতো সেদিন গলায় মালা দিয়ে এলাকায় যাব।' সান্টু মাথাটা উঁচু করে বলল, 'আমরা তখন বড়-সড় নেতাও হয়ে যেতে পারি।'

সন্ধ্যার দিকে বাপ্পীর ছোট চাচা ঘরে ঢুকে বললেন, 'কিরে, একেবারে সব কিছু নাকি উলট-পালট করে ফেলেছিস! অফিসের কাজে এতদিন চিটগাং ছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি আমি।'

'মোটেই সব কিছু উলট-পালট করিনি চাচু, মাত্র তিনটা সাবজেক্টে ফেইল করেছি।' বাপ্পী মনটা খারাপ করে বলে, 'এরকম ফেইল দুনিয়ার অনেকেই করে। আমার মনে হয় বাবাও করেছে, তুমিও করেছ।'

'তোর বাবা কখনো ফেইল করেনি, আমিও ফেইল করিনি। তবে একবছর পরীক্ষা দেইনি।' ছোট চাচা হাসতে হাসতে বলেন।

'কোন ক্লাসে পরীক্ষা দাওনি?' খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে বাপ্পী।

ছোট চাচা চোখ দুটো সরু করে বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুই যেভাবে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলি তাতে তো মনে হচ্ছে তোরও কোনো বছর পরীক্ষা দেওয়া ইচ্ছে নেই।'

'তুমি ঠিক ধরেছ, চাচু। একটা বছর আমি পরীক্ষা দেব না।'

'পরীক্ষা না দিয়ে তুই কী করবি?'

'তুমি কি করেছ?'

'আমি তো সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়েছিলাম।'

'সুন্দরবনে গিয়েছিলে! ওখানে বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেলেনি?' বাপ্পী হাসতে হাসতে বলে।

ছোট চাচাও হাসতে হাসতে বলেন, 'কী জানি, আমাকে খেয়ে ফেলেছিল কি না ঠিক মনে করতে পারছি না।'

বাপ্পী ছোট চাচুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ফেইল করে আমি তো মনে হয় মহা অন্যায় করে ফেলেছি, চাচু।'

'অবশ্যই এটা মহা অন্যায়। ফেইল করে কারা?' ছোট চাচা বাপ্পীর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলেন, 'কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ফেইলটা তুই ইচ্ছে করেই করেছিস। তোকে তো আমি চিনি।'

'আমরা যা পড়ি, আমাদের যা পড়ানো হয়, তার কি সবগুলোই ঠিক। ক্লাস ওয়ানে এখনো আমাদের হাতের লেখা শেখানো হয়। তুমি বলো- আগামী দু তিন বছরের মধ্যে মানুষ আর হাতে লিখবে না, ল্যাপটপে লিখবে। আমাদের এখনো যে সব অঙ্ক শেখানো হয় তা কি শেখার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? কম্পিউটারে আগামীতে যেসব প্রোগ্রাম আসছে তাতে তুমি শুধু কী বোর্ডে চাপ দেবে, সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে।'

'এসব যদি না শেখাবে তাহলে কী শেখানো উচিত আমাদের?' ছোট চাচা বাপ্পীর মাথায় আবার হাত বুলিয়ে বলেন, 'আমাকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে দে।' কথাটা শেষ করে বাপ্পীর বিছানার ওপর পা তুলে বসলেন।

ছোট চাচার পাশে বসল বাপ্পী। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমার

অনেকগুলো ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে তা তো তুমি জানো? রাশিয়ার একটা ফ্রেন্ড আছে আমার, চেমাকভ নাম। আমার মতোই ক্লাস সেভেনে পড়ে। গত সপ্তাহে ও কি লিখেছে, জানো? ও নাকি আর ক্লাস সেভেনে পড়বে না।'

'তাহলে কী পড়বে?'

'ওর খুব শখ উন্নত মানের একটা রোবট বানানো শিখবে ও। তবে তা প্রচলিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে নয়।'

'প্রচলিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হয়ে কিছু বানানো যায় নাকি?' ছোট চাচা কিছুটা অবজ্ঞার স্বরে বলেন।

'এবার তুমি আমাকে বলো তো-রেডিও আবিষ্কারের আগে মার্কনি কোথায় ভর্তি হয়েছিলেন? বালব আবিষ্কারের আগে টমাস আলভা এডিসন কোথায় এটা বানানোর শিক্ষা নিয়েছেন। কম্পিউটার আবিষ্কারের আগে হাওয়ার্ড আইকেন কী বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেছেন? তুমি তো ভালো করে জানো চাচু-এ পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে সেটা বানানোর কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না আগে। একটা জিনিস আবিষ্কারের পর সেটাকে আরো উন্নত করে বানানোর জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।'

ছোট চাচু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠে বলেন, 'তুই তো দেখি একেবারে মহাজ্ঞানীর মতো কথা বললি!'

'আমি তো মহাজ্ঞানীই, চাচু।' বাপ্পী হাসতে হাসতে বলে, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না-আমরা যা হতে চাই আমাদের বাবা-মারা আবার তা চান না। আবার বাবা-মারা যা চান, আমরা তা হতে চাই না। এটা কেন? কেন অনেকদিন ধরে এ ব্যাপারটা চলে আসছে!'

'তুই কি হতে চাস বল তো?'

'যখন যা খুশি তাই হতে চাই।'

'তুই তো আর সুপারম্যান না যে যখন যা খুশি হতে পারবি।'

'যা খুশি হওয়ার জন্য সুপারম্যান হতে হয় না, চাচু। মানুষের ইচ্ছাটাই আসল। তুমি তো সাংবাদিক হতে চেয়েছ, তুমি কিন্তু তা-ই হয়েছে। কিন্তু তুমি লেখাপড়া করেছ বোটানি নিয়ে। দাদুর ইচ্ছা ছিল বাবা ডাক্তার হবে, কিন্তু বাবা বিসিএস দিয়ে হয়েছে সরকারি অফিসার। ছোট চাচু শোনো-।' বাপ্পী একটু থেমে বলে, 'তোমরা মন খারাপ করো না, আমি আমার মতোই

হবো। আমার যখন ইচ্ছে করবে আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করব, আবার যখন মাছ ধরতে ইচ্ছে করবে তখন বড়শী দিয়ে মাছ ধরব। কখনো কখনো আমার কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে, তখন আমি হারিয়ে যাব।'

'লেখাপড়ার পাশাপাশি এসব করতে কেউ তো তোকে মানা করেনি।'

'আমি যে লেখাপড়া করি না এটা তোমাকে কে বলল? আমি যে তিন সাবজেক্টে ফেইল করেছি সেই তিন সাবজেক্ট সম্বন্ধে আমি অনেকের চেয়ে বেশি জানি। তোমার বিশ্বাস না হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে পারো।'

'কিন্তু তোর বাবা-মা এভাবে মন খারাপ করে আছে!'

'বাবা-মা আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথাও বলে না।'

বাপ্পীর কাছ ঘেঁষে বসে ছোট চাচু বলেন, 'তোকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি আমি। দেখবি ভাইয়া আর ভাবী তোর জন্য পাগল হয়ে গেছে। যদি তা না হন তাহলে বুঝবি তারা তোকে আর আগের মতো ভালোবাসে না।'

বেশ উত্তেজনা নিয়ে বাপ্পী বলে, 'বুদ্ধিটা বলো তো, চাচু।'

ছোট চাচু বাপ্পীর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমি যা বলব তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবি। যেভাবে বলব সেভাবে কাজ করবি।'

বাপ্পী ছোট চাচুর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'অবশ্যই চাচু। তুমি যা বলবে আমি তা-ই শুনব, সেভাবেই কাজ করব।'

'তাহলে কাগজ আর কলম দে আমাকে।' পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে সবচেয়ে ভালো একটা কলম আর ধবধবে সাদা কাগজের একটা প্যাড এসে চাচুর হাতে দিল বাপ্পী।

রন্টু, তপু, ইন্দ্র, সান্টু আর চপল দাঁড়িয়ে আছে থানার সামনে। প্রচুর মানুষ থানার ভেতর। এক ফাঁকে রন্টু জানালা দিয়ে দেখেছে থানার বড় অফিসের টেবিলের সামনে রুপম বসে আছে। ওর বাবাও বসে আছে ওর পাশে। কিন্তু ওকে নিয়ে কথা বলছে মোটামতো একটা লোক। সম্ভবত ওটা রুপমের মামা। ওনাকে দেখে মনে হয়েছে টাকাওয়ালা একজন মানুষ, ক্ষমতাশালীও।

থানার ভেতর এতো মানুষ দেখে ওরা আর ভেতরে ঢোকেনি। ইন্দ্র বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'দুনিয়াটা খারাপ কাজে ভরে গেছে।'

সান্টু কিছুটা শব্দ করে বলল, 'কীভাবে বুঝলি?'

'থানায় সাধারণত কারা আসে? খারাপ মানুষ আসে। দেখছিস না থানার ভেতর মানুষ দিয়ে বোঝাই। খারাপ কাজ যত বেশি হয়, তত বেশি মানুষ থানায় আসে।'

'মাঝে মাঝে যে ভালোও মানুষও আসে।'

'হ্যাঁ, আমাদের রুপমের মতো।'

রুপমের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই থানার গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল, রুপম বের হয়ে আসছে গেট থেকে। পাশে ওর বাবা, আরেক পাশে মোটামতো ওই লোকটা। কিছুদূর হেঁটে এসে তারা একটা চকচকে লাল রঙের গাড়িতে উঠল। একটু পর সেটা চলে গেল সামনের রাস্তার দিকে, রুপমদের বাসার দিকে। তপু থু করে একদলা থুতু ফেলে বলল, 'আল্লায় জানে বাসায় যাওয়ার পর রুপমের কপালে কী আছে!'

০৬.

বাসা থেকে বের হতে নিতেই থমকে দাঁড়ালেন শাহরিয়ার সাহেব। অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। ওয়ারড্রোবের ওপর থেকে হাত ঘড়িটা নিতে গিয়েই একটা কাগজ চোখে পড়ে তার। কাগজটা ভাঁজ করা। সেটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে দেখেন-চিঠি। চিঠিটা বাপ্পী লিখেছে।

প্রিয় আব্বু, প্রিয় আম্মু

তোমরা যখন এ চিঠিটা পাবে তখন আমি অনেক দূরে। আমাদের পাড়ার সবচেয়ে দুষ্ট ছেলে সোহেল, নয়ন, বাবু, মান্নুর সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাচ্ছি। ওদেরকে তোমরা চেনো তো? সোহেল হচ্ছে মারাত্মক একটা ছেলে, যে এর আগে একটা মানুষের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওর ইচ্ছে আরো একটা লোকের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে ও। তবে কার পেটে ঢুকাবে তা এখনো বলেনি। ও আজ আমাকে শেখাবে কীভাবে মানুষের পেটে ছুরি ঢুকাতে হয়!

নয়নের কাজই হলো চুরি করা। এ পর্যন্ত ও মারাত্মক মারাত্মক জিনিস চুরি করেছে। তিনটা দামী মোবাইল, দুইটা ল্যাপটপ, কয়েক হাজার টাকা, তাছাড়া বেশ কয়েকজনের সোনার গয়নাও চুরি করেছে ও। আমার বয়সী একটা ছেলে কীভাবে এত কৌশলে চুরি করে! ওকে আমি যত দেখি ততই মুগ্ধ হয়ে যাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, আহারে ওর মতো যদি চুরি করতে পারতাম! নয়নও আজ আমাকে শেখাবে কীভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করতে হয়, টুক করে মোবাইলটা হাতে নিয়ে পকেটে রাখতে হয়, তারপর মোবাইল বন্ধ করে সিম খুলে ফেলতে হয়।

বাবু হচ্ছে পুরোদমে একটা নেশাখোর ছেলে। এমন কোনো

জিনিস নাই যে ও নেশা করেনি। ওর নেশা করা দেখে আমি নিজেই ভয় পেয়ে যাই। কিছুদিন পরপর ও পাগলের মতো হয়ে যায়। ওদের বাসার জিনিসপত্র ইচ্ছে মতো ভেঙে ফেলে। কিন্তু ওর বাবা-মা ওকে কিছু বলে না। ওকে ভীষণ ভয় পান তারা। সেদিন ও কী করেছে জানো? ওর বাবা নতুন একটা ফ্ল্যাট টিভি এনেছিলেন, রাগ করে ও ক্রিকেট খেলার ব্যাট দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে সেটা। বাবু আজ আমাকে একটা কিছু খাওয়া শেখাবে। ব্যাপারটা ভাবতেই আমি কেমন যেন শিহরিত হয়ে যাচ্ছি।

মান্নুকে দেখলে ভয় পায় না, এমন মানুষ এখনো দেখিনি আমি। ওর কাজই হচ্ছে মেয়েদের টিজ করা। এ নিয়ে কত কী যে হয়ে গেল, কিন্তু কেউ ওকে থামাতে পারেনি। কিন্তু একটা কথা বলতেই হয় ওর মতো স্মার্ট ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। কী সুন্দর যে ওর মাথার চুল! কাপড়-চোপরও পড়ে খুব দামী দামী। তবে ওর জুতোগুলোও বেশ দামী হলেও আমার তেমন পছন্দ হয় না। কেমন যেন সেকেলে. সেকেলে লাগে। ও আজ আমাকে একটা মেয়েদের স্কুলের সামনে নিয়ে যাবে, তারপর আমাকে শেখাবে কীভাবে মেয়েদের টিজ করতে হয়।

আব্বু, বলো তো কেমন লাগছে এখন তোমাদের? আম্মু, তোমার কি এখন কান্না পাচ্ছে? সোহেল, নয়ন, বাবু, মান্নুর মতো ছেলে আমাদের আশপাশে এখন অনেক। ওদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন অনেকেই। সেই অনেকের মতো আমিও একজন, আমিও হতে যাচ্ছি একজন খুনি, চোর, নেশাখোর, ইভ টিজার।

চিঠিটা পড়া শেষ করে শাহরিয়ার সাহেব বাপ্পীর আম্মুর হাতে দিলেন। ঝটপট পড়ে ফেলে তিনি চিৎকার করে উঠে বললেন, 'কী লিখেছে তুমি পড়েছো?'

শাহরিয়ার সাহেব খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'পড়েছি।'

বাপ্পীর আম্মু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ভালো করে পড়েছো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো করেই পড়েছি।'

'তুমি বুঝতে পারছো আমাদের ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!'

'নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি, নষ্ট অলরেডি হয়ে গেছে।'

'না, পরীক্ষায় দু-এক সাবজেক্টে ফেইল করলেই কোনো ছেলে নষ্ট হয়ে

যায় না। তোমার অফিসে যেতে হবে না আজ, আমিও যাব না। তুমি ওকে খুঁজে নিয়ে আসো। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'অসম্ভব। আমার জরুরি মিটিং আছে।'

'নিজের ছেলের চেয়ে অফিস বড় হলো তোমার?'

ওয়ারড্রোবের ওপর থেকে ঘড়িটা হাতে বেধে সানগ্লাসটা নিতেই গিয়েই আরেকটা ভাঁজ করা কাগজ দেখতে পান শাহরিয়ার সাহেব। খুব নির্ভারভাবে কাগজটা হাতে নিয়ে খুলে দেখেন এটাও একটা চিঠি।

> আব্বু, আম্মু, প্রথম চিঠিটা নিশ্চয় এতক্ষণ পড়ে ফেলেছ তোমরা? এবার এই চিঠিটা পড়ো-
>
> না, তোমরা যা ভাবছো তা না। আমিও ওরকম খুনি, চোর, নেশাখোর, ইভ টিজার হতে পারতাম। কিন্তু আমি সেইসবের কিছুই হইনি, হবোও না। এতো খারাপ কি আমি কখনো হতে পারি, বলো? যদি হতাম তাহলে কী করতে তোমরা বলো তো? আমি মাত্র তিনটা সাবজেক্টে ফেইল করেছি, সেইসব সাবজেক্টের সবকিছুই জানি আমি, আমি ফেইল করেছি ইচ্ছে করে। কী জানি, আবার হয়তো পাশও করতে পারি, খুব ভালো করে পাশ করতে পারি। তার আগে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে আব্বু-আমার ঘরের পড়ার টেবিলে পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডটা আছে, সেখানে একটা সই লাগবে যে তোমার!
>
> ইতি তোমাদের তিন সাবজেক্টে ফেইল করা ছেলে বাপ্পী।

দ্বিতীয় চিঠিটাও পড়া শেষ করে বাপ্পীর আম্মুর হাতে দিলেন শাহরিয়ার সাহেব। এ চিঠিটাও ঝটপট পড়ে ফেললেন তিনি। তারপর বিমর্ষ চেহারাটায় হাসি এনে বললেন, 'তোমার ছেলেটা বড্ড দুষ্ট হয়ে গেছে!'

বাসার পেছনে জঙ্গলের মতো যে ছোট্ট জায়গাটা আছে, এতক্ষণ সেখানে বসেছিল বাপ্পী। আব্বু-আম্মু অফিসে চলে যাওয়ার পর ও আবার বাসায় ফিরে এল। দ্রুত পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেখে পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডটা যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই আছে, সই করা তো দূরের কথা, আব্বু সেটা ছুঁয়েও দেখেনি।

কিছুটা মন খারাপ হয়ে গেল বাপ্পীর। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। দাদুর ঘরে ভেন্টিলেটরে চড়ুই দুটো বাসা বানানো শেষ করেছে। পাখি

সাধারণত ডিম পাড়ার সময় বাসা বাধে। গলায় কালো রঙের পুরুষ পাখিটা ভেন্টিলেটরের সামনে তারের ওপর বসে আছে, মেয়ে পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত সে বাসায় বসে ডিম দিচ্ছে।

'ভাইয়া, আসব?'

বাপ্পী আড়চোখে দরজার দিকে তাকাল। ছোট ভাই শাফিন দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। এ ঘরে ও নিষিদ্ধ। কারণ এ ঘর থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলো জিনিস বাপ্পীকে না বলে নিয়েছে ও এবং সবগুলো জিনিসই কম-বেশি নষ্ট করে ফেলেছে। শাফিন সবচেয়ে বড় খারাপ কাজটা করেছে বাপ্পীর ক্রিকেট খেলার ব্যাটটা নিয়ে। স্কুল থেকে ফিরে বাসায় এসে একদিন দেখে ওর ব্যাটটার হাতল ভাঙা। বাপ্পীর বুঝতে অসুবিধা হয় না এটা কার কাজ। কিন্তু রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে সে। কারণ পরের দিন একটা ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট ছিল ওর। তারপর থেকে শাফিনের এ ঘরে আসা নিষেধ। বাপ্পী যখন ঘরে থাকবে তখন অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

আড়চোখে তাকিয়ে বাপ্পী বলল, 'কোনো দরকার আছে তোর?'

'দরকার আমার নেই, দরকার তোমার।' শাফিন মুচকি হেসে বলল।

'আমার দরকার! যা ভাগ, তোর কাছে আমার কোনো দরকার নেই।' বাপ্পী জানালার দিকে ঘুরে বসে বলে, 'নিশ্চয় তুই কোনো কিছু নিতে এসেছিস আমার কাছ থেকে। তোকে আমি একটা জিনিসও দেব না।'

'সত্যি বলছি ভাইয়া, আমি কোনো জিনিস নিতে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছিস, বল?'

'বললাম না তোমার একটা দরকারে এসেছি।'

বাপ্পী জানালার দিকে তাকিয়েই বলল, 'বল।'

'ঘরের ভেতর এসে বলি।'

'না, ওখানে দাঁড়িয়েই বল।'

শাফিন গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস করে বলল, 'এখান থেকে বললে অনেকে শুনে ফেলবে। কেউ জেনে গেলে লজ্জা পাবে তুমি।'

কিছুটা অনিচ্ছা নিয়ে বাপ্পী বলল, 'ঘরের ভেতর এসে দ্রুত কথাটা বলে চলে যাবি। এক সেকেন্ডও দেরি করতে পারবি না। তাহলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব কিন্তু তোকে।'

দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে শাফিন বলল, 'তুমি তো তিন সাবজেক্টে ফেইল

করেছ। আব্বু নাকি তোমার ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করবে না হেডস্যারের কাছে, তুমি তাই পরীক্ষাও দিতে পারবে না। তোমাকে এবারও তাহলে ক্লাস সেভেনে থাকতে হবে।'

'ক্লাস সেভেনে থাকলে তুই খুশি হবি?'

'আমি তো এবার ক্লাস ফাইভে, আগামীবার ক্লাস সিক্সে উঠব। তুমি যদি আগামীবারও তিনি সাবজেক্টে ফেইল করো, তাহলে আগামীবারও তোমার ক্লাস সেভেনেই থাকতে হবে। তখন আমিও ক্লাস সেভেনে উঠে যাব। আমরা দু ভাই একই ক্লাসে পড়ব, ভাবতেই মজা লাগছে আমার।' কথাটা শেষ করে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যায় শাফিন।

বাপ্পীর রাগ হলো ভীষণ। শাফিনকে ধরে দু গালে চারটা থাপ্পড় মারতে পারলে খুব ভালো লাগত। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা করা যাবে না। আব্বু তাহলে আরো বেশি রেগে যাবেন।

আব্বুর বেডরুমে চলে এল বাপ্পী। টিএন্ডটি থেকে ফোন করল ছোট চাচুকে। দু বার রিং বাজার পর চাচু ফোন ধরতেই বাপ্পী বলল, 'তোমার বুদ্ধিটা তো কাজে লাগল না, চাচু!'

'কাজে লাগেনি!' ছোট চাচু একটু হতাশার স্বরে বললেন, 'আমি যেভাবে লিখে দিয়েছিলাম চিঠিটা সেভাবেই লিখেছিলি তো?'

'হুবহু তোমার চিঠিটা কপি করেছি চাচু। দাড়ি, কমাও কোনোটা বাদ দেইনি।' বাপ্পীও হতাশা নিয়ে বলে।

'দুটো চিঠিই লিখেছিলি, না?'

'হ্যাঁ, দুটোই।'

'তার মানে তোর রিপোর্ট কার্ডে সই করেনি ভাইয়া।'

'একটা কিছু করো, চাচু।'

ছোট চাচু একটু চুপ থেকে বলেন, 'আচ্ছা, তুই কোনো টেনশন করিস না। আমি নতুন একটা বুদ্ধি বের করছি।'

'কিন্তু আরেকটা তো সমস্যা হয়ে গেছে।'

'আবার কী হলো?'

'বাবা তো রিপোর্ট কার্ডে সই করেইনি। একটু আগে শাফিন বলল, বাবা

নাকি আমার জন্য হেডস্যারের কাছে কোনো সুপারিশও করবে না।' বাপ্পী মন খারাপ করে বলল, 'তার মানে আমাকে আগামী বছরও ক্লাস সেভেনে থাকতে হবে। এটা একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার না, চাচু? আমার সব ফ্রেন্ড ক্লাস এইটে পড়বে আর আমি পরে থাকব সেভেনে!'

'ব্যাপারটা প্রেস্টিজেরই।' চাচু একটু ভেবে বলেন, 'তোকে এটা নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। কাল কিংবা পরশু তোদের বাসায় গিয়ে ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলে সব ম্যানেজ করে ফেলব।'

'আরো একটা কথা-।' বাপ্পী গলাটা নিচু করে বলে, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়? বাসা থেকে সত্যি সত্যি পালিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'ওটা করা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'ভাইয়া, ভাবী আরো কষ্ট পাবেন। তাছাড়া পালিয়ে যাবিইবা কোথায়? দেখা গেল কোথাও পালিয়ে যাচ্ছিস এবং পালিয়ে যাওয়ার সময় কোনো বড় ধরনের অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেল! তখন তোকে সাহায্য করবে কে?'

'সেটাও তো ঠিক।' বাপ্পী একটু থেমে বলল, 'জানো, রেজাল্ট বের হওয়ার পর থেকে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছি। ওরা অন্য স্কুলে পড়ে, আমি আরেক স্কুলে পড়ি। ওরা আমার রেজাল্ট জানে না, তবু দেখা করি না ওদের সঙ্গে।'

'না, এটা ঠিক করিসনি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা দরকার। কখন, কোন সময় তাদের কাজে লাগে।'

'আমি আরো একটা খারাপ কাজ করেছি। মোখলেশ ব্যাপারী নামে এক বদমাস লোক সরকারি জায়গা দখল করে ঘর তুলেছে। আমাদের খেলার কোনো জায়গা নেই, ওই জায়গাটাই ছিল একমাত্র সম্বল। কয়েকদিন আগে রাতে ওই ঘরটা পুড়ে দেওয়ার কথা ছিল আমার।'

'তুই ঘরে আগুন দিবি।'

'আমরা বন্ধুরা মিলে এর চেয়েও বড় বড় কাজ করি। কিন্তু মনে রেখো, আমরা কোনো অন্যায় কাজ করি না। যা করি, অন্যায়কে প্রতিরোধ করার কাজ করি।' বাপ্পী লজ্জামাখা গলায় বলে, 'তোমাকে আরেকটা কথা বলি?'

'কথা বলবি এতে লজ্জার কী আছে! বল।'

'আমি তোমার অফিসে চলে আসি? তোমার অফিস শেষে আমাকে নিয়ে অনেকক্ষণ রিকশায় ঘুরাবে। রাতে বাসায় ফেরার আগে কোথাও চায়নিজ খাওয়াবে। চাচু, আসব?'

'এখনই চলে আয়। তুই আসার সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে ছুটি নেব আমি। তোর জন্য আজ আমার সব কাজ বন্ধ ঘোষণা করলাম। হাজার হলেও তুই, আমার বড় ভাতিজা।'

'থ্যাংক ইউ।' চোখ জল এসে গেছে বাপ্পীর, 'বাসায় একদম ভালো লাগছিল না, চাচু।'

০৭.

বাবা বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসা থেকে বের হয়ে এল রুপম। রুন্টুরা সবাই বসে আছে সান্টুদের পুরাতন বাড়ির ছাদে। দশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে রুপম বলল, 'এ দু দিনে অনেক কিছু শিখে ফেলেছি রে।'

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে রুপমের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'তোর অনেক কষ্ট হয়েছে, না?'

রুপম হাসতে হাসতে বলল, 'মোটেই না। বরং অনেক আনন্দ পেয়েছি। আমরা তো ঘরে আগুন দিয়েছিলাম। আমার বড় মামা ও তার বন্ধুরা মিলে কী করেছিল, জানিস?'

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কী?'

'মামারা তখন ছোট, আমাদের চেয়ে একটু বড়। মামাদের গ্রামের একজন নব্য ধনী লোক ছিল। তার একটাই মেয়ে ছিল, মেয়েটির বিয়ে। যেহেতু লোকটা নতুন ধনী হয়েছে সেহেতু সে বেছে বেছে গ্রামের ধনী লোকগুলোকে বিয়েতে দাওয়াত দেয়। কিন্তু বাড়ির আশপাশের কিছু গরিব প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেয় না সে। মামারা তখন কেবল বড় হচ্ছেন, ব্যাপারটা খারাপ লাগে তাদের।'

'আমাদের মতোই আর কি।' রন্টু হাসতে হাসতে বলে, 'কোনো খারাপ কাজ দেখলে আমাদের যেমন খারাপ লাগে, তোর মামা ও তার বন্ধুদেরও তেমন খারাপ লেগেছিল।'

'আচ্ছা-।' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'তোর নানার বাড়ি তো ওই লোকটার গ্রামেই, তোর নানাকে দাওয়াত দিয়েছিল?'

'নানাকে দাওয়াত না দিয়ে উপায় আছে!' রুপম কিছুটা গর্বিত ভঙ্গিতে

বলল, 'আমার নানা ছিল ওই এলাকার সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। নানার টাকা-পয়সাও ছিল অনেক। নানার একটা লোহার মস্তবড় সিন্দুক ছিল। নানী একদিন আমাদের চুপিচুপি বলেছিল, ওই সিন্দুকটা নাকি সোনার হরেকরকম গয়না দিয়ে বোঝাই।'

'আগেকার দিনে অনেকেরই এরকম সিন্দুক ছিল, সিন্দুক বোঝাই সোনার গয়না ছিল। আমার বড় ঠাকুরদার তো দুইটা সিন্দুক ছিল।' ইন্দ্র সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ইন্ডিয়ায় চলে যাওয়ার আগে সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে গেছে।'

'এখন ওসব সিন্দুক-টিন্দুক থাক।' সান্টু রুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর বড় মামার কথা বল।'

'যেহেতু আশপাশের অনেক গরিব লোককে দাওয়াত দেওয়া হয়নি সেহেতু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মামারা। বিয়েতে রোস্ট করার জন্য অনেকগুলো মুরগি কেনা হয়েছিল, সব মুরগি চুরি করা হবে।' রুপম চোখ দুটো চক চক করে বলে, 'মামারা ছিল এগার জন বন্ধু। বিয়ের আগের রাতে মামারা সাতাশটা মুরগি চুরি করেছিল।'

'এতগুলো মুরগি কী করেছিল? রন্টু জিজ্ঞেস করে।

'এগারজন মানুষ তো অতগুলো মুরগি খেতে পারে না। চারটা মুরগি রান্না করে খেয়েছিল, বাকী মুরগিগুলোর পায়ের দড়ি কেটে সারা গ্রামে ছেড়ে দিয়েছিল।' রুপম আবার হাসতে হাসতে বলে, 'ওসব ছেড়ে দেওয়া মুরগিগুলো নাকি একেকজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।'

'তার মানে ওই মুরগিগুলো তাদের হয়ে গিয়েছিল।' রন্টু রেলিংয়ের ওপর পা তুলে বসে বলে, 'তুই এসব জানলি কী করে, রুপম?'

'আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর বড় মামা এসে উপস্থিত।'

'ওই মোটা লোকটা তাহলে তোর মামা?' চপল জিজ্ঞেস করল।

'মামাকে তোরা দেখেছিস নাকি?'

'তোকে থানায় ধরে নিয়ে আসার পর আমরাও থানায় এসেছিলাম। ওসি সাহেবের রুমে তোর মামা আর তোর বাবাকে বসে থাকতে দেখে ভয়ে ঢুকতে সাহস হয়নি আমাদের কারো।' ইন্দ্র বলল।

'মামা এসে দেখে ওসি সাহেব তার খুবই পরিচিতি। এ-কথা সে-কথা

বলতে বলতে শেষে ঘরে আগুন দেওয়ার কথা আসে। আমি বলি, হ্যাঁ ঘরে আমি আগুন দিয়েছি। ওই ঘরটা অবৈধ, কারণ ওটা সরকারি জায়গা। এ এলাকায় কোনো খেলার মাঠ নেই, ওই জায়গাটায় আমরা বিকেল হলে খেলি, কিন্তু মোখলেশ ব্যাপারী জোর করে ওখানে ঘর তুলেছে।'

'আমাদের কথা কিছু বলিসনি?' ইন্দ্র খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'বলেছি না! বলেছি তোরা হচ্ছিস আসল মানুষ।' রুপম ছাদের ওপর পা দুটো মেলে দিয়ে বসে বলে, 'তারপর আসল ঘটনা শোন। মামা তার ছোটকালের মুরগি চুরির ঘটনাটা বলতেই ওসি আঙ্কেল হাসতে হাসতে বললেন, ছোটকালে আমরাও ওরকম দু-একটা কাজ করেছি। ওসি আঙ্কেলের গ্রামে একটা লোকের বড় একটা আনারসের বাগান ছিল। লোকটা নাকি খুব কৃপণ ছিল, কাউকে কখনো কোনো আনারস দিতেন না। একদিন ওসি আঙ্কেলের কয়েকজন বন্ধু মিলে অনেকগুলো আনারস চুরি করে খেয়েছিলেন। ওসি আঙ্কেল প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে হাসতে বলেন, সেদিন এতগুলো আনারস খেয়েছিলেন জিভ আর মুখের ভেতরটা নাকি ভয়ঙ্করভাবে ছিলে গিয়েছিল তাদের। তিন-চার দিন কোনোরকম ঝাল তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারেননি তারা, শুধু দুধভাত আর মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়ে থেকেছেন।'

'থানায় তো অনেক ধরনের মানুষ আসে, না?' রন্টু জিজ্ঞেস করল।

'বিচিত্ররকমের মানুষ আসে। ছাগল চোর আসে, গরু চোর আসে, সিঁদকাটা চোর আসে, পকেটমার আসে, খুনি আসে।' রুপম মুচকি মুচকি হাসতে বলে, 'এক লোক এসেছে বিয়ে করে।'

'বিয়ে করে মানে?' ইন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

'লোকটা বিয়ে করেছে অন্য একটা লোকের বউকে। সেই লোকটা থানায় জানিয়েছে। পুলিশ আবার ধরে এনেছে তাকে।'

'বিয়ে করবি অবিবাহিত মেয়েকে বিয়ে কর, অন্যের বউকে বিয়ে করার দরকার কী?' ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল, 'মানুষজন ইদানীং উল্টা-পাল্টা কাজ করা শুরু করেছে। আচ্ছা-।' ইন্দ্র সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'সান্টুদের বাড়িতে আসলেই সান্টুকে পাওয়া যায় না। সেদিন এসেছিলাম সেদিনও ছিল না, আজও নেই। গেছে কোথায় ও।'

'আন্টি বলল না ওর কে যেন অসুস্থ। হাসপাতালে খাবার দিতে গেছে তাকে, একটু পরেই এসে পড়বে।' রন্টু রুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোকে যে ছাড়ল, এমনি এমনি ছাড়ল?'

'না। টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে মোখলেশ ব্যাপারীকে।'

'কত টাকা?'

'সেটা জানতে পারিনি। আব্বু বোধহয় আজ সকালে টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছে তাকে।'

'আমরা তো তাহলে হেরে গেলাম।' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলল

'হ্যাঁ, আমরা সত্যি সত্যি হেরে গেছি।' সান্টু ছাদের মাঝখানে এসে বলল, 'আসার সময় দেখে এলাম মোখলেশ ব্যাপারী মহা উৎসাহ আর উদ্যম নিয়ে আবার ঘর তুলছে। পাশ দিয়ে আসছিলাম, মৃধা আমাকে দেখে ওর পাশের লোকজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, এবার ঘরে যদি কেউ কিছু করে তবে তার হাত-পা নাকি সব ভেঙে দেবে।'

রন্টু রেলিং থেকে নেমে বলে, 'এটা বলেছে ও!'

'শালার সাহস দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে আমার।' সান্টু তপুর মতো একদলা থুতু ফেলে বলল, 'শালাকে একটা টাইট না দেওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না।' সান্টু চপলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, শালাকে টাইট করার একটা বুদ্ধি বের কর তো। ভালো কথা-।' সান্টু ছাদের ওপর বসতে বসতে বলল, 'ইন্দ্রদের বাড়ির পাশের ওই নদীটাতে আজও একটা লাশ ভেসে এসেছে।'

'কখন?' চপল লাফ দিয়ে উঠে বলল।

'এই তো একটু আগে।'

'এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যদি ভেসে না যায় আজ রাতে লাশটা ওখানেই থাকবে। এতো লাশ আসছে, পুলিশও এখন বিরক্ত। সকালের আগে লাশ নিতে আসবে না। এর আগেই একটা কাজ করতে হবে আমাদের।'

সবাই প্রায় একসঙ্গে আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী কাজ?'

'মৃধাদের ঘরের তো শুধু বেড়া পুড়তে পেরেছিলাম আমরা। সবটুকু

পোড়ার আগেই পানি দিয়ে নিভে ফেলে মোখলেশ ব্যাপারী। ওই বেড়াটুকু আজকেই কমপ্লিট হয়ে যাবে, না?' চপল সান্টুকে জিজ্ঞেস করল।

'বেড়া তো কমপ্লিটই হয়ে গেছে।'

চপল সবার তিকে একপলক তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'আজ রাতে ওই লাশটা আমরা তুলে আনব।'

'বলিস কী?' রুপম চমকে উঠে বলে।

চপল রুপমের চমকে ওঠাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'তারপর ওই লাশটা মোখলেশ ব্যাপারী ওই ঘরের মেঝেতে পুতে রাখব।'

'তারপর?' রন্টু চোখ চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করল।

'তারপর গলার স্বর নকল করে পুলিশকে খবর দেব।' চপলকে কেমন জেদি-জেদি দেখাচ্ছে।

'গুড আইডিয়া!' তপু কিছুটা ভীত গলায় বলল, 'কিন্তু লাশটা তুলবে কে? কার এত সাহস?'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল ইন্দ্র। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তুলব। কারো যদি ভয় লাগে আসার দরকার নেই, সাহস থাকলে আমার সাথে আসবে, কিন্তু নদী থেকে লাশটা আমি হাত দিয়ে ধরব।

সবাই মহা উৎসাহে রাজী হয়ে গেল। কেবল তপু একটু নিচু গলায় বলল, 'রাতে কখন?'

'রাত দুইটায়।' ইন্দ্র বেশ সাহস নিয়ে বলল।

দরজায় শব্দ করে ঘরে ঢুকে ছোট চাচা বললেন, 'তোর তো সব সমস্যার সমাধান করে ফেললাম।'

বাপ্পী কিছু বলল না। মন খারাপ ওর।

'কিরে মন খারাপ নাকি তোর?'

'তোমাকে না বললাম, ভালো লাগছে না আমার। তোমার অফিসে যাব আমি, তুমি রাজীও হলে। কিন্তু পর ফোন করে আমাকে নিষেধ করলে।' কান্না কান্না গলায় বাপ্পী বলল।

'আগে শুনবি তো কেন নিষেধ করেছি। তুই ফোন করার পর ভাইয়াকে ফোন করে বললাম, তুমি বাপ্পীর স্কুলে না যাও, আমি গিয়ে ব্যবস্থা করে

আসি। ভাইয়া তো রাজীই হয় না। এদিকে তোদের রেজাল্ট বের হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে নাকি রিপোর্ট কার্ড জমা দিতে হয়। আজ তো শেষ দিন ছিল। ভাইয়াকে অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়ে তোদের স্কুলে গিয়েছিলাম। হেডস্যার তোর কথা শুনে বলেন কি জানিস?'

বাপ্পী আস্তে করে বলে, 'কী?'

'ওতো বেশ ভালো ছাত্র! হঠাৎ কেন যে ফেইল করল!' চাচু বাপ্পীর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলেন, 'কাল থেকে স্কুলে যাবি তুই। কোনো সমস্যা হবে না।'

'চাচ্চু-।' বাপ্পী এটুকু বলে থেমে যায়।

'থামলি কেন, বল?'

আরো কিছুক্ষণ থেমে থেকে বাপ্পী বলে, 'আমি কি খুব বেশি অন্যায় করে ফেলেছি?'

'খুব বেশি না হলেও বেশ খানিকটা তো করেছিস?'

'তোমার ছেলে যদি আমার মতো দু-এক সাবজেক্টে ফেইল করে তুমি কি তখন তাকে বলতে পারবে, যা তোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না।'

'সম্ভবত এ ধরনের কথা আমি আমার ছেলেকে বলতে পারব না।'

'কিন্তু আব্বু আজ আমাকে এ কথাটা বলেছে।'

'কখন বলেছে?'

'আগে অফিস থেকে আসার পর রাতে খাওয়ার সময় আব্বু আমাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসে খেতেন। কয়দিন ধরে ডাকছেন না। আজ আমি ভাবলাম, আব্বু না ডাকুক, আমি একাই যাব। যাওয়ার পর আব্বু আমাকে বলেন, আমার নাকি মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না তার। তারপর কি করল জানো?' বাপ্পী কাতর চোখে চাচুর দিকে তাকায়।

'কী?' চাচু কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।

'আব্বু তার খাবারের থালা নিয়ে ডায়নিং রুম থেকে বেড রুমে চলে গেলেন।' বাপ্পী বেশ শব্দ করে কেঁদে উঠে বলেন, 'আমি খুব কষ্ট পেয়েছি চাচু, কষ্টে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কষ্ট পাওয়ারই কথা।' চাচু বাপ্পীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তোর বাবার যখন তোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না, তাহলে একটা কাজ করতে পারিস,

একটা মুখোশ কিংবা বড় টুপিওয়ালা একটা জামা কিনে পরে থাকতে পারিস তুই। সারাক্ষণ এমনি এমনি থাকলি, তোর বাবা যখন বাসায় থাকবে তখন ওটা পড়ে নিবি।'

'কীসের মুখোশ পরব?'

'অনেকরকমের মুখোশ আছে-রাক্ষসের মুখোশ আছে, ভূতের মুখোশ আছে, বাঘের মুখোশ আছে, পেঁচার মুখোশ আছে।'

বাপ্পী চাচুর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই, তুমি আমাকে একটা মুখোশ কিনে দেবে?'

'কোন মুখোশ পছন্দ তোর?'

'ভূতের মুখোশ। আব্বু যখন আমার মুখ দেখতে চায় না, এখন থেকে তাহলে মুখোশ পড়েই থাকব।' কথাটা শেষ করে বাপ্পী আবার কাঁদতে থাকে। ওর কান্না দেখে ছোট চাচুর চোখেও পানি এসে যায়।

০৮.

সান্টু থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ মেলে চারপাশটা দেখল। ভালো করে এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'এ যে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার রে! এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।'

সামনের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্র বলল, 'যতই অন্ধকার হোক লাশটা আমি তুলবই, প্রয়োজন হলে একা তুলব! তারপর মোখলেশ ব্যাপারীর একদিন কি আমাদের একদিন।'

থু করে একদলা থুতু ফেলতে নিয়েই থেমে গেল তপু। নিঃশব্দে থুতুটা ফেলে ইন্দ্রর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিস?'

ইন্দ্র কিছু বলার আগেই সান্টু ওদের পাশে এসে বলল, 'হ্যাঁ, কার যেন কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

কিছুটা বিরক্ত হয়ে ইন্দ্র বলল, 'কান্নার শব্দ কোথায় পাচ্ছিস তুই!'

'ওই তো, একটু পর পর থেমে থেমে কে যন কাঁদছে। কিছুটা চাপা গলায় কাঁদছে। মনে হচ্ছে কেউ একজন খুব কষ্ট নিয়ে কাঁদছে।'

কান পাতলো ইন্দ্র। প্রথমে তেমন কিছু শুনতে পেল না। নদীর পানি বয়ে যাওয়ার অল্প একটু শব্দ হচ্ছে, সেটা শোনা যাচ্ছে। তবে শব্দটা কোনোভাবেই কান্নার শব্দের মতো না। কিছুটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মতো। তপু ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শুনতে পাচ্ছিস? কান্নার শব্দের মতোই শোনা যাচ্ছে ওটা। বাচ্চাদের কান্নার মতো। ভালো করে কান পেতে শোন।'

আবারও কান পাতলো ইন্দ্র। বেশ কিছুক্ষণ ওভাবে কান পেতে রাখার পর শব্দটা শুনতে পেল ও-সম্পূর্ণ মানুষের কান্নার শব্দ। মনে হচ্ছে কে যেন

ভয়াবহ দুঃখে কাঁদছে, একা একা কাঁদছে। মানুষটা কাঁদার পর থেমে যায়, একটু পর আবার কেঁদে ওঠে। বোঝা যাচ্ছে কান্না লুকাতে চাচ্ছে সে, কিন্তু পারছে না। ব্যাপারটা সান্টু আর তপুকে বুঝতে দিল না ও। ও নিজে যদি স্বীকার করে ফেলে কিংবা ওর ভাবভঙ্গিমায় বোঝা যায় ওটা সত্যি সত্যি মানুষের কান্না, তাহলে ওরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাবে, ভয়ে ওরা অজ্ঞান হয় যেতে পারে, এমন কি দৌড়েও পালিয়ে যেতে পারে।

ঘাড়ের পেছন দিয়ে শিরশির করে কী যেন বয়ে গেল ইন্দ্রর। অল্প অল্প ঘামও টের পাচ্ছে কানের দু পাশ দিয়ে। চারদিকে সুনসান নিঃশব্দতা, আর নিকষ কালো অন্ধকার। বেশ দূরেও যদি কেউ নিশব্দে নিশ্বাস ফেলে সেটার শব্দও শোনা যাবে স্পষ্টভাবে। সান্টু ইন্দ্রর পিঠটা খামচে ধরে বলল, 'কি রে কিছু বলছিস না যে!'

'ভাবছি, লাশটা তুলব কীভাবে?' ইন্দ্র তপুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চটের বস্তা নিয়ে এসেছিস তো?'

'এই তো, আমার হাতে। দড়িও নিয়ে এসেছি।'

'একটা চর্চ লাইট আনলে ভালো হতো।'

'টর্চ লাইট তো ছিল। ওটা রন্টু নিয়ে গেছে।' ইন্দ্র পকেট থেকে প্লাস্টিকের একটা বল বের করে বলল, 'একটা বল আছে আমার হাতে, চায়নিজ বল। এটাতে টোকা দিলেই টিপটিপ করে লাইট জ্বলে ওঠে। দশ সেকেন্ড জ্বলে থাকার পর আবার নিভে যায়।'

সান্টু কিছুটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বলটা জ্বালানো ঠিক হবে না। ওটা জ্বালালে অনেক দূর থেকেও আমরা যে এখানে তা বোঝা যাবে। আমাদের যা করতে হবে অন্ধকারেই করতে হবে।'

'একদম ঠিক কথা। তপু-।' ইন্দ্র তপুকে বলল, 'বলটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেল। হঠাৎ পড়ে গিয়ে আরো জ্বলে উঠতে পারে।'

'কিন্তু এই অন্ধকারে কাজটা করব কীভাবে?'

'যেভাবেই হোক করতে হবে। ওদিকে রন্টু, চপল আর রুপম গেছে মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরের কাছে। ওখানে গিয়ে ওরা ঘরের দরজার তালা ভাঙবে, ঘরের ভেতর ঢুকবে, মেঝে খুরবে। অনেক কাজ ওদের। দেখা গেল ওরা সব কাজ সেরে বসে আছে, আমাদের তখনো এখানে।' ইন্দ্র নদীর

দিকে আরো একটু এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমরা লাশ নিয়ে যাব, তারপর যত দ্রুত সম্ভব সেটা ব্যাপারীর ঘরের মেঝেতে পুতে রেখে যার যার বাড়ি ফিরে আসতে হবে আমাদের।'

সান্টু আবার ইন্দ্রর একটা হাত খামচে ধরে বলল, 'শব্দটা আরো জোরে শোনা যাচ্ছে। এখন তো মনে হচ্ছে একটা মানুষ না, অনেকগুলো মানুষ কাঁদছে। পাল্লা দিয়ে কাঁদছে। আমরা তো কেবল নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, নদীতো আরো বেশ খানিকটা নিচে। তুই একটু ভেবে দেখ ইন্দ্র, একেবারে নদীর কাছাকাছি যাওয়া ঠিক হবে কি না আমাদের।'

'ঠিক না হওয়ার কী আছে। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত রন্টু ওখানে সব কাজ সেরে অপেক্ষা করবে। দেখা গেল আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ওরা বসেই আছে। ওদিকে মোখলেশ ব্যাপারীর লোকজনের কেউ একজন ঘরে ঢুকে রন্টুদের দেখে ফেলল। সর্বনাশ হয়ে যাবে তখন।'

'কিন্তু এত অন্ধকার! তার মাঝে কারা যেন সুর করে কাঁদছে! ভয়ে তো আমার বুকের ভেতর লাফালাফি শুরু হয়ে গেছে।' সান্টু বেশ কাকুতি মিনতি করে বলে।

'ভয়ে হিসু করে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলার চেয়ে বুকের ভেতর লাফানো অনেক ভালো। তুই বরং এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি একা গিয়েই লাশটা নিয়ে আসছি।' তপুর হাত থেকে ইন্দ্র চটের বস্তা আর দড়িটা নিয়ে বলল, 'তপু তোরও যদি ভয় করে তুইও সান্টুর সঙ্গে থেকে যেতে পারিস।'

'না না, আমার ভয় করছে না।' থু করে একদলা থুতু ফেলে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করার চেষ্টা করল তপু।

না, আমারও ভয় করছে না।' সান্টু কিছুটা গটগট করে এগিয়ে যেতেই নিতেই উপুর হয়ে পড়ে যায়। তারপর গড়তে গড়তে নদীর একেবারে কিনারায় গিয়ে ঠেকে সে। ইন্দ্র কোনো দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে সান্টুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর হাতরে হাতরে ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'কোথাও ব্যথা পেয়েছিস?'

'না, ব্যথা পাইনি। ভয় পেয়েছি। সামনের জায়গাটা যে এতো নিচু বুঝতেই পারিনি।' সান্টু ইন্দ্রর হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে বলল, 'ভালোই হলো ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে আর নামতে হলো না।' পাশে তাকাল সান্টু, 'তপু কোথায় রে?'

'এই তো আমি এখানে।' তপু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'ওখানে কী করছিস?'

'দেখ দেখ, নদীর কিনারায় কতগুলো মাছ, চুপচাপ মাটির সঙ্গে লেপ্টে আছে! চাঁদ এতক্ষণ মেঘেতে ঢেকে ছিল, খেয়ালই করিনি। চারদিকে কেমন ফর্সা দেখাচ্ছে এখন।' তপু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ পূর্ণিমা নাকি রে?'

'এখন কেউ পূর্ণিমার হিসাব রাখে নাকি! পূর্ণিমা কী জিনিস সেটাও জানে না। পূর্ণিমা এখন থাকে কবিতায়।' ইন্দ্র নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুরদারা নাকি আগে নদীতে এসে খালি হাতেই অনেক মাছ ধরতেন। মাছরা নাকি এভাবে কিনারায় এসে থাকত, হারিকেনের আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে যেত মাছদের, তখন টুপ করে হাত দিয়ে মাছটা ধরা হতো।'

'মাছের কথা থাক এখন। আমাদের এখন লাশটা দরকার।' সান্টু আশপাশে তাকিয়ে বলল, 'কোথাও তো দেখছি না লাশটা।'

ইন্দ্র সান্টুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে ডান পাশে এগিযে গেল। মাথা নিচু করে নদীর পানির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তোদের বাসা থেকে সবাই যখন যার যার বাসায় চলে গেল আমি তখন এখানে এসে লাশটা দেখে গেছি। এখানেই তো ছিল লাশটা।'

সান্টু আর তপু ইন্দ্রর পাশে এসে বলল, 'কই গেল লাশটা?'

ইন্দ্র ভালো করে নদীর পানির দিকে তাকাল। ডান দিক থেকে বাম দিকে পানি বয়ে যাচ্ছে। স্রোতটা ওদিকে যাচ্ছে। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল তো বা দিকের ওপাশে যাই।'

তিনজন মিলে বা দিকে এগিয়ে গেল। না, লাশটা এদিকেও নেই। তপু হঠাৎ আরো একটু সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওখানে অনেকগুলো কচুরিপানা জড়ো হয়ে আছে।'

তপুর কথা শেষ হওয়ার আগেই ইন্দ্র ওদিকে দৌড়ে গেল। হ্যাঁ, লাশটা ওখানেই আছে। কচুরিপানার সঙ্গে লেগে ভেসে আছে।

চটের বস্তাটা সান্টুর হাতে আর দড়িটা তপুর হাতে দিয়ে ইন্দ্র বলল, লাশটা সম্ভবত ভীষণ ভারী হয়ে গেছে। তবু আমি দু হাত দিয়ে জাপটে ধরে তুলে বস্তার ভেতর ভরব। সান্টু বস্তাটা ফাঁক করে ধরে রাখবি, লাশটা বস্তায়

ভরার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি দিয়ে সেটা বেধে ফেলবে তপু। সম্ভবত লাশটা থেকে পচা গন্ধ বের হওয়া শুরু হয়েছে।'

নদীর একেবারে কিনারাতেই লাশটা ভেসে আছে, দু হাত উঁচু করে ভেসে আছে। ভাগ্যিস, কচুরিপানা জড়ো হয়ে ছিল, ওর সঙ্গে লেগে আছে লাশটা, না হলে ভেসে অনেকদূর চলে যেত। ইন্দ্র এসব ভাবতে ভাবতেই লাশটার একটা হাত টেনে ধরে। আরো একটু কাছে টেনে জাপটে ধরে। তারপর ঝট করে উঁচু করে বস্তার কাছে নিয়ে আসে। সান্টু বস্তাটা ফাঁক করেই ধরে ছিল, তার ভেতর ওটা ঢুকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ইন্দ্র বলল, 'অসম্ভব ভারী রে। কেমন যেন পিচ্ছিল হয়ে গেছে লাশটা।'

'গন্ধও বের হয়ে গেছে।' বস্তাটা বাধতে বাধতে তপু বলল।

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস?' সান্টু কপালটা কুঁচকে বলল।

ইন্দ্র খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী?'

'কান্নার শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না।' সান্টু বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল।

কান পেতে ভালো করে শুনে ইন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ, কান্নার শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না।' ইন্দ্র একটু থেমে বল, 'সম্ভবত ওগুলো শেয়ালের শব্দ ছিল। লাশটা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল আর শব্দ করছিল। আমাদের দেখেই পালিয়ে গেছে। চল, এখানে আর দেরি করার দরকার নেই।'

তিনজন লাশের বস্তাটা নিয়ে নদীর কিনারা থেকে উপরে উঠে আসতেই তপু কিছুটা শব্দ করে বলল, 'ওই দেখ, কে দাঁড়িয়ে আছে?'

সান্টু আর ইন্দ্র ঝট করে সামনের দিকে তাকাল। একটা মাঠের ভেতর একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বস্তাটা মাটিতে নামিয়ে ইন্দ্র বলল, 'কে?'

মানুষটা কথা বলল না। দু দিকে বাড়ানো হাত দুটো কেবল একটু নড়ে উঠল তার। ইন্দ্র আবার বলল, 'কে ওখানে?'

এবারও কথা বলল না মানুষটা। হাত দুটো আগের মতোই নড়ে উঠল। কিছুটা রেগে গিয়ে ইন্দ্র বলল, 'কী, কথা কানে যায় না! বলছি না কে ওখানে? উত্তর দিচ্ছেন না কেন!'

মানুষটা আগের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দ্র মানুষটার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বলল, 'সান্টু-তপু, আমার সঙ্গে আয় তো। দেখি, কোন শালা দাঁড়িয়ে আছে।'

তিনজন একসঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই ফিক করে হেসে ফেলল। এতক্ষণ চাঁদটা আবার মেঘের নিচে লুকিয়েছিল, এই মাত্র সেটা বের হয়ে আসতেই ওরা দেখতে পেল ধানক্ষেতের মাঝখানে একটা কাকতাড়ুয়া দাঁড় করানো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। কেবল পুরনো শার্টের লম্বা হাতা দুটো একটু পর পর নড়ে উঠছে বাতাসে।

লাশের বস্তাটা নিয়ে মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরের কাছে পৌঁছতেই রন্টু দাঁত কটমট করে বলল, 'এতো দেরি করলি যে তোরা!'

ইন্দ্র বস্তাটা মাটিতে রেখে বলল, 'দেরি কী আর সাধে করেছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার-।' ইন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে সান্টু সংক্ষেপে খুব দ্রুত সব কিছু বলে ফেলল। রন্টু আর কিছু বলল না। লাশের বস্তাটা ধরতেই চপল আর রুপমও এগিয়ে এল। ঘরের ভেতর নিয়ে খুলে ফেলল ওরা বস্তাটা। তারপর বের করে আলতো করে নামিয়ে দিল গর্তের ভেতর। ইন্দ্র এগিয়ে এসে মাটি চাপা দিতে দিতে বলল, 'বস্তা আর দড়িটা কিন্তু ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না।'

রুপম বস্তা আর দড়িটা ভাঁজ করে চপলের হাতে দিয়ে বলল, 'মাটি খুব সমান হতে হবে। মাটি সমান করার পর পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।'

সান্টু রুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পানি পাব কোথায় এখন?'

'দুই লিটারের বোতলে ভর্তি করে পানি এনেছি আমি।'

দশ বারো মিনিটের মধ্যে মাটি চাপা শেষ করে মোখলেশ ব্যাপারীর ঘর থেকে বের হয়ে এল ওরা। দরজাটা ভালো করে চাপিয়ে তালা লাগিয়ে রন্টু বলল, 'আজ আর কোথাও অপেক্ষা করা যাবে না। তাড়াতাড়ি যার যার বাড়ি যেতে হবে। রাত অনেক হয়ে গেছে। বাকী কাজ কাল সকালে করব আমরা।'

মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ি পার হয়ে বড় রাস্তার পাশে বড় গাছটার আড়ালে আসতেই একটা চিৎকার শুনল ওরা। থমকে দাঁড়াল ওরা সঙ্গে সঙ্গে। রন্টু ফিসফিস করে বলল, 'কীসের চিৎকার শুনলাম আমরা?'

তপুও রন্টুর মতো ফিসফিস করে বলল, 'মানুষের চিৎকার।'

'এতো রাতে মানুষের চিৎকার আসল কোথা থেকে!' সান্টু ভয় ভয় গলায় বলল।

রন্টু কী একটা বলতে নিয়েই থেমে যায়। মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির ভেতর থেকে কারা যেন পা টিপে টিপে বের হচ্ছে। সবার মুখ বাধা, কালো কাপড় দিয়ে বাধা। ইন্দ্র সবাইকে ইশারা করে বলল, 'এখানে আর এক মুহূর্ত নয়, সবাইকে নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুত পালাতে হবে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

০৯.

রামনাপুর থানার ওসি আব্দুল হাই তরফদার অফিসে বসে মনোযাগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। অফিস টাইম এখনো শুরু হয়নি, কিন্তু তিনি অফিসে এসে উপস্থিত। শুধু আজকে না, ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিনও তিনি সকাল সকাল অফিসে চলে আসেন। বাসায় ভালো না লাগলে কোনো কোনো দিন ছুটির দিনও আসেন তিনি। তার এই সকালে অফিসে আসার একটাই কারণ- পত্রিকা পড়েন তিনি অফিসে। বাসায় যে পত্রিকা পড়া যায় না, তা না। তবে গভীর মনোযোগ এবং পুঙ্খনোপুঙ্খ ভাবে পত্রিকা পড়ার জন্য অফিস হচ্ছে আসল জায়গা। দেশে যতই খুন-খারাবি-রাহাজানি-ছিনতাই হোক না কেন, এত সকালে সাধারণত কেউ থানায় আসে না।

পত্রিকা পড়তে পড়তে বাম দিকে চোখ যায় তরফদার সাহেবের। কয়েকটি মৃত্যু ও রহস্যজনক কিছু কা -বড় বড় অক্ষরে লেখা হেডিংটার নিচে পড়তে পড়তে তিনি অবাক হয়ে যান। তার নিজের এলাকায় এতসব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে আর তিনি এসবের কিছুই জানেন না। তার এলাকায় প্রায়ই খুন হচ্ছে, এটা তিনি জেনেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা যে এতো মহামারীর আকার ধারন করেছে তা তিনি টের পাননি।

বিরক্ত হয়ে পেপারটা কিছুটা ছুড়ে রেখে দিলেন টেবিলের ওপর। পড়তে ইচ্ছে করছে না এখন। পেছনে তোয়ালে বিছানো চেয়ারে হেলান দিয়েই তিনি আবার সোজা হয়ে বসলেন। চিৎকার করে ডাক দিলেন, 'মতলব, ওই মতলব।'

কনস্টেবল মতলব আলী দ্রুত রুমে ঢুকে লম্বা একটা স্যালুট দিয়ে বললেন, 'জি, স্যার।'

'আমার চেয়ারের এই তোয়ালেটা এত গন্ধ কেন?'

'কীসের গন্ধ, স্যার?'

'কীসের গন্ধ আবার! ঘামের গন্ধ।'

'স্যার, ওই চেয়ারে তো কোনো গরু-ছাগলকে কখনো বসতে দেখিনি, ওরা বসতে চাইলেও আমরা বিশেষ করে আমি বসতে দিলে তো। তাছাড়া গরু-ছাগলের গায়ে কখনো ঘামও দেখিনি আমি। সুতরাং ওটা তো আপনার গায়ের ঘামের গন্ধই, স্যার।'

'তুমি ইদানীং বড্ড বেশি কথা বলো, মতলব।'

একটু নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে মতলব আলী বললেন, 'জি, স্যার।'

'তুমি যে ইদানীং বেশি কথা বলো এটা বুঝতে পারো?'

'জ্বি, স্যার।'

'বুঝতেই যদি পারো তাহলে এতো বেশি কথা বলো কেন তুমি?' ওসি আব্দুল হাই তরফদার সাহেব কিছুটা রুঢ় স্বরে বললেন।

'আমার বাপ-দাদারা রাজনীতিবিদ ছিলেন তো। তারা সবসময় মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, বক্তৃতা-টক্তৃতা দিতেন, ভাষণ-সমাবেশ করতেন। আমি রাজনীতিবিদ হতে না পারলেও বংশানুক্রমিকভাবে অভ্যাসটা রয়ে গেছে আর কি!' মতলব আলী কথাটা শেষ করে হাসতে থাকেন।

বেশ অবাক হয়ে ওসি আব্দুল হাই তরফদার সাহেব মতলব আলীর দিকে তাকালেন। মুখটা এখনো হাসি হাসি হয়ে আছে তার। লোকটার বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু দেখায় তারচেয়ে কম। টানা শরীর, মেদ বলতে কিছুই নেই, ভুড়ি তো নেই-ই। কিন্তু তার নিজের শরীরে কমপক্ষে ত্রিশ কেজি চর্বি, আর ছয়চল্লিশ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ভুড়িটার ওজনও হবে কমপক্ষে এক মণ। থুতনি নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, চারপাশে মাংস জমে চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে একেবারে বিশ্রী দেখায় তাকে। ওসি সাহেব সোজা হয়ে বসে বললেন, 'যাও।'

'তোয়ালেটা বদলিয়ে দিতে বলি?'

'না থাক, পরে বদলিয়ে দিলে হবে।' তরফদার সাহেব পেপারটা আবার হাতে নিলেন, কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করছে না। তার মাথার ভেতর একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে-প্রায় প্রতিটা থানার ওসিদের এত বড় ভুড়ি হয় কেন, আর কনস্টেবলদের শরীর এতো শুকনো থাকে কেন?

পড়তে ইচ্ছে না করলেও খুনের খবরটার দিকে চোখ মেললেন তিনি। আবার পড়তে শুরু করলেন সেটা। কিন্তু এগুতে পারলেন না। দরজায় শব্দ করে মতলব আলী ঢুকেছেন রুমে। আব্দুল হাই তরফদারের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্যার, একটা চিঠি এসেছে আপনার নামে।'

তরফদার গম্ভীর মুখে বললেন, 'টেবিলের ওপর রেখে যাও।'

'চিঠিটা এখনই পড়া দরকার, স্যার।'

'এখনই পড়া দরকার কেন?' তরফদার সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন।

'আমার মনে হচ্ছে এটা খুব জরুরি একটা চিঠি।'

'জরুরি চিঠি!' তরফদার সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, 'তুমি জানলে কী করে এটা জরুরি চিঠি?'

'যে দিয়ে গেল সে খুব ভয় ভয় গলায় বলেছে, এটার ভেতর নাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা লেখা আছে।'

'গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লেখা আছে সেটা আবার তোমাকে বলেছে!'

নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে মতলব আলী হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'জ্বি, স্যার, আমাকে বলেছে।'

মেজাজটা খারাপ হয়ে গলে তরফদার সাহেবের। মতলব আলী সত্যি খুব বেশি কথা বলে। তিনি সকাল সকাল অফিসে আসেন পত্রিকার পড়ার জন্য, কিন্তু পড়া তো দূরের কথা, ভালো করে চোখই মেলাতে পারলেন না।

স্যারের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে দেখে মতলব আলী আর কোনো কথা না বলে চিঠিটা রেখে বাইরে চলে গেল। তরফদার সাহেব টেবিলে রাখা চিঠিটার দিকে তাকালেন। সাদা একটা খামের ভেতর চিঠিটা। পেপারটা পাশে রেখে খামটা হাতে নিয়ে খুলে ফেললেন তিনি। ভাঁজ করা চিঠিটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে-

> শ্রদ্ধেয় ওসি সাহেব, গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দেওয়ার জন্য আপনার কাছে এই চিঠিটা লেখা। উত্তরপাড়ায় মোখলেশ ব্যাপারী নামে ভয়ঙ্কর একটা লোক আছে। এমন কোনো খারাপ কাজ নাই যে সে করে না। মানুষও খুন করে সে। বিশ্বাস না হলে উনি যে নতুন একটা ঘর তুলেছেন সেটার মেঝে খুড়ে দেখুন।

আর একটা কথা-এলাকায় এত খারাপ কাজ হচ্ছে, আর আপনারা কী করছেন! আপনাদের তো কোনো গরু নেই, তাহলে ঘাস কাটছেন কার জন্য? বসে বসে ঘাস না কেটে ব্যাপারটার দিকে নজর দিন। দিনে দিনে মোখলেশ ব্যাপারীর সংখ্যা তো বেড়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। এভাবে বাড়তে থাকলে একদিন হয়তো আপনাদেরকেও...। প্লিজ, দ্রুত মোখলেশ ব্যাপারীর ঘর চেক করুন, খবরের সত্যতা যাচাই করুন।

ইতি কয়েকজন সমাজ সচেতন মানুষ

চিঠিটা পড়া শেষ তরফদার সাহেব অবজ্ঞা দিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখলেন। এ ধরনের চিঠি তাদের কাছে দু-একটা করে প্রতিদিনই আসে। কিছু খারাপ মানুষ ভালো কোনো মানুষকে ফাঁসানের জন্য এভাবে চিঠি লিখে পুলিশের কাছে পাঠায়। তিনি আবার পেপার পড়তে শুরু করলেন।

থানা থেকে বেশ খানিক দূরে একটা গাছের আড়াল দাঁড়িয়ে আছে রন্টুরা। চিঠিটা কনস্টেবল মতলব আলীর হাতে ইন্দ্র একা এসে দিয়ে গেছে। তারপর এখানে এসে ওরা অপেক্ষা করছে চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওসি সাহেব দ্রুত গাড়ি নিয়ে মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির দিকে যায় কি না। কিন্তু পনের মিনিট কেটে গেল ওসি সাহেব থানা থেকে বের হলেন না। কিছুটা হতাশার স্বরে সান্টু বলল, 'ওই চিকনা পুলিশটা বোধহয় ওসি আঙ্কেলকে চিঠিটা দেয়নি।'

'না, দিয়েছে।' ইন্দ্র কিছুটা প্রতিবাদী স্বরে বলল, 'ওই চিঠিটার সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকাও তো দিয়েছি। আমি নিজেই তো দেখলাম টাকাটা পকেটে রেখে চিঠিটা নিয়ে ওসি সাহেবের রুমে গেলেন তিনি।'

'কিন্তু ওসি আঙ্কেল এখনো মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির দিকে যাচ্ছেন না কেন?' বেশ অস্থির হয়ে বলল সান্টু।

'আমার মনে হয়-।' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'ওসি আঙ্কেল সম্ভবত একা যেতে ভয় পাচ্ছেন, তাই আরো পুলিশ যোগাড় করার চেষ্টা করছেন। আরো পুলিশ যোগাড় হলেই তিনি মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির দিকে রওনা দেবেন।'

'কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার মনে বেশ খটকা লাগছে।' রন্টু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে পাশে একটা উঁচু জায়গায় বসে পড়ল।

'কোন ব্যাপারটা?' রুপম জিজ্ঞেস করল।

'এরই মধ্যে মোখলেশ ব্যাপারী যদি টের পায় তার ঘরের মেঝেতে একটা লাশ লুকানো আছে, তাহলে তো সেটা তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। তখন তো আমরা হেরে যাব।' রন্টু আগের মতোই চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

'টের পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।' চপল বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলল, 'মেঝে খুড়ে আমরা লাশটা লুকিয়েছি বটে, কিন্তু কাজটা শেষ করার পর মেঝেটা ঠিক আগের মতোই করে রেখে এসেছি। কোনোভাবেই টের পাওয়ার কথা না।'

'তারপরও কেমন যেন লাগছে। ওসি আঙ্কেল মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে মেঝে খুড়ে লাশ না বের করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়।' সান্টু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'থানার টেলিফোন নম্বর তো আমাদের কাছে আছে। ওসি আঙ্কেলকে ফোন করে জানালে কেমন হয়?'

'ফোন করলে উনি টের পাবেন না।' তপু ভয় ভয় গলায় বলল।

'মোটেই না। তোরা তো জানিস আমি অন্যরকম গলায় কথা বলতে পারি, হুবহু বুড়ো মানুষের গলার মতো।' সান্টু বুড়ো মানুষের মতো গলা করে বলল, 'কী, আমি কি ঠিক বললাম বাপুরা?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। রন্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, দেরি করলে সবকিছু গুবলেট হয়ে যেতে পারে।'

রন্টুর পাশে দাঁড়িয়ে সান্টু বলল, 'হ্যাঁ চল। এখন একটুও দেরি করা ঠিক হবে না আমাদের।'

থানা থেকে প্রায় কোয়ার্টার কিলোমিটার দূরে কয়েকটা টেলিফোনের দোকান আছে। সেখানকার একটা দোকানের কাছে গিয়ে সান্টু বলল, 'তোরা অন্য একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক। আমি একা গিয়ে ফোনটা করে আসি। সবাই মিলে গেলে টের পেয়ে যেতে পারে কেউ না কেউ।'

রুপম সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সান্টু ঠিকই বলেছে। আমরা সবাই ওদিকে একটা জায়গায় অপেক্ষা করি। ও একা গিয়ে ওসি আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলে আসুক।'

সবাই ওদিকে চলে গেল। সান্টু একটা টেলিফোনের দোকানে গিয়ে ওসি সাহেবকে ফোন করল। একবার রিং বাজার পর ওসি সাহেবই ফোনটা ধরলেন। সান্টু হুবহু বুড়ো মানুষের মতো গলা করে বলল, 'রামনাপুর থানার ওসি সাহেব বলছেন?

'জি, বলছি।' খুক করে কেশে ওসি সাহেব বললেন, 'কে বলছেন?'

'আমাকে আপনার না চিনলেও চলবে।' সান্টু গলাটা আরো বুড়োদের মতো করে বলল, 'আপনি একটু আগে একটা চিঠি পেয়েছেন?'

'কোন চিঠি?'

'ওই যে মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরে মেঝেতে একটা লাশ লুকানো...।' সান্টুকে কথা শেষ করতে দিলেন না ওসি সাহেব। কিছুটা হালকা ভাবে তিনি বললেন, 'সত্যি ওনার ঘরের মেঝেতে কোনো লাশ লুকানো আছে নাকি?'

'সেটা তো আপনি গেলেই দেখতে পাবেন।'

'এসব উড়ো চিঠির কোনো মূল্য নেই আমাদের কাছে।'

'তাই নাকি?'

ওসি সাহেব আর কোনো কথা না বলে ফোনটা কেটে দিলেন। রিসিভারটা রাখতেই আবার বেজে উঠল ফোনটা। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে একজন বললেন, স্বরাষ্ট্র সচিব কথা বলবেন। সঙ্গে সঙ্গে ওসি সাহেব কিছুটা সোজা বসে বললেন, 'জ্বি।'

স্বরাষ্ট্র সচিব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আব্দুল হাই তরফদার সাহেব, আজ পত্রিকায় দেখলাম আপনার এলাকায় ইদানীং অনেক খুন হচ্ছে। সচিবালয়ে এই নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। আপনি দ্রুত একটা রিপোর্ট পাঠান।'

রন্টুরা একটু পর দেখল, থানার গাঢ় নীল রঙের গাড়িটা মোখলেশ ব্যাপারীর বাড়ির দিকে বেশ দ্রুত গতিতে ধেয়ে যাচ্ছে। সবার মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

মুখোশের মতো লাল একটা জামা পরে চুপচাপ বসে আছে বাপ্পী। ছোট চাচা গতকাল এটা কিনে দিয়ে গেছেন। তিনি ভূতের মুখোশ আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেক খুঁজেও ঠিক ভূতের মুখোশ পাওয়া যায়নি। জামাটা দেওয়ার সময় চাচু বলে গেছেন, 'তোর আব্বু যেহেতু তোর মুখ দেখতে চায় না

তাহলে এটা কয়েকদিন পরে থাক। দেখ, তারপর কী হয়। আর একটা কথা-।' চাচা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'এটা কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তোর জন্য একটা গিফট। আগামীকাল তো আসতে পারব না, জরুরি একটা কাজ আছে, তাই আজকেই দিয়ে গেলাম।'

বাপ্পীর আজ জন্মদিন। প্রতিবছর জন্মদিনের আগের রাতে বারোটার বাজার সঙ্গে সঙ্গে আব্বু আর আম্মু তার ঘরে এসে হ্যাপি বার্থ ডে বলে যেতেন, তারপর বিভিন্ন রকমের চকলেট রেখে যেতেন তার টেবিলে। সবশেষে অন্যরকম একটা গিফট তুলে দিতেন তার হাতে। গতবার আব্বু তাকে একটা মাস্টার পিস ডিভিডি গিফট করেছিলেন। সেখানে শিশুদের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত সাতটি মুভি ছিল। সাতটি মুভিই বাপ্পী দেখেছে, বন্ধুদের সঙ্গে করে নিয়ে দেখেছে। প্রতিটি মুভি দেখার পর আনন্দে কেঁদে ফেলেছে সে। এত সুন্দর করে সিনেমা বানানো যায়! বাপ্পী তো মনে মনে একটা সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছে-বড় হলে এমন সুন্দর সুন্দর মুভি বানানো শিখবে, তারপর একের পর এক মুভি বানাবে।

কাল রাতে আব্বু আম্মু তার ঘরে আসেননি, চকলেটও রেখে যাননি, গিফটও না। সাধারণত বার্থ ডের সন্ধ্যায় কেক কাটা হয়, অনেককে দাওয়াত দেওয়া হয়। আজ সন্ধ্যায় কোনো কেক কাটা হয়নি, কাউকে দাওয়াতও দেওয়া হয়নি। সারাদিন বাপ্পী ঘরেই বসেছিল। একটু পর পর তার মনে হয়েছে-এই বুঝি আব্বু আম্মু চুপিচুপি তার পেছনে এসে দাঁড়াবেন, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলবেন, হ্যাপি বার্থ ডে, বাপ্পী। দরজায় একটু শব্দ হলেই সে ভেবেছে আব্বু আম্মু বুঝি এসেছেন। কিন্তু না, আব্বু আম্মু আসেননি, হ্যাপি বার্থ ডেও বলেননি।

দরজায় শব্দ হলো। বাপ্পী সেদিকে তাকাল না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল। একটু পর শাফিন বাপ্পীর একটা হাত ধরে বলল, 'ভাইয়া, হ্যাপি বার্থ ডে।'

বাপ্পী আস্তে করে বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

'তোমার তো অনেক মন খারাপ ভাইয়া। কারণ আব্বু আম্মু তোমাকে হ্যাপি বার্থ ডে বলেনি, কেকও আনেনি। আমার তো বেশি টাকা নেই, ঈদের সালামি পেয়েছিলাম যে, সেই টাকাগুলো রয়েছে। ওই টাকাগুলো দিয়ে তোমার জন্য একটা জিনিস কিনে এনেছি আমি।'

বাপ্পী ঘুরে বসে খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কী কিনেছিস তুই?'

শাফিন হাসতে হাসতে ওর পেছন থেকে হাত দুটো সামনে এনে বলল, 'তোমার জন্য হরলিকস কিনে এনেছি। বড়টা কিনতে পারিনি, ছোটটা কিনেছি। হরলিকস খেলে নাকি ব্রেন ভালো হয়। ব্রেন ভালো হলে তুমি আর ফেইল করবে না, আব্বুর বকাও খেতে হবে না। তুমি বকা খেলে আমার খুব মন খারাপ হয়, ভাইয়া।'

বাপ্পী শাফিনকে কাছে টেনে এনে ওর মাথায় একটা হাত রাখে। চোখে পানি এসে গেছে ওর। একটু পর ও খেয়াল করল, ওর মুখোশের মতো জামার নিচ দিয়ে থুতনির দিকে পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। পানিগুলো একসময় টপটপ করে মেঝেতে পড়তে লাগল।

১০.

মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। ওসি আব্দুল হাই তরফদারের নেতৃত্বে সবগুলো পুলিশ সটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বন্দুক হাতে। গ্রামের মানুষজন সব জড়ো হয়ে আছে এক সাথে। সবার কৌতুহল কী আছে ওই ঘরের ভেতর! কেন পুলিশ ঘিরে রেখেছে ঘরটা! একটা হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে ওসি সাহেব সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর মুখের সামনে মাইক নিয়ে সকলের উদ্দেশ্য বললেন, 'সম্মানীত জনগণ, আমরা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি এই ঘরের ভেতর একটা লাশ লুকানো আছে।'

টুপি মাথায় দেওয়া একটা বৃদ্ধলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'কীসের লাশ লুকানো আছে, বাবা?'

'মানুষের লাশ।' ওসি আব্দুল হাই তরফদার উত্তর দিলেন।

'মানুষের লাশ!' বৃদ্ধটি চমকে উঠে বললেন, 'এখানে মানুষের লাশ আসবে কোথা থেকে!'

'সেটাই আমরা জানতে এসেছি।'

'এটা তো দেখছি বাবা কেয়ামতের আলামত। লাশ থাকবে কবরস্থানে, লাশ দেখি এখন ঘরের ভেতর। এটা ভালো লক্ষণ না বাবা। কেয়ামত কাছে এসে গেছে।' বৃদ্ধলোকটি বিলাপের সুরে বললেন, 'মানুষের ঈমান-আমান সব নষ্ট হয়ে গেছে, কেয়ামত তো আসবেই!'

ওসি আব্দুল হাই তরফদার আরো একটু এগিয়ে গিয়ে মাইকে বলতে লাগলেন, 'আপনারা কেউ আর সামনে এগিয়ে আসবেন না। আমরা এখন ঘরের দরজা ভাঙব, তারপর দেখব ঘরের ভেতর কী আছে!'

কনস্টেবল মতলব আলী এগিয়ে এসে বললেন, 'স্যার, ঘরের দরজা যে ভাঙব কী দিয়ে ভাঙব? কোনো কিছু তো আনা হয় নাই।'

'একটা শাবল অথবা কুড়ালের ব্যবস্থা করো।'

'জি স্যার, থানায় একটা পুরাতন শাবল ছিল সেটা নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছ।' ওসি সাহেব মাইকটা একজনের হাতে দিয়ে শাবলটা নিজ হাতে নিলেন। মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। কিন্তু ঘরের কাছাকাছি যেতেই কোথা থেকে যেন ঝড়ের বেগে মোখলেশ ব্যাপারী এসে উপস্থিত। ওসি আব্দুল হাই তরফদারের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা কী করছেন স্যার আপনি?'

'আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজা হচ্ছে, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

'এই তো স্যার। আমার কাজই হচ্ছে মানুষের উপকার করে বেড়ানো। ও পাড়ায় একজনের ঝামেলা ছিল, ঝামেলা মিটিয়ে এলাম।' হাত দিয়ে ইশারা করে মোখলেশ ব্যাপারী বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন! আসুন, আমার বসার ঘরে এসে বসুন। এখানে এলেন, চা-পানি খাবেন না!'

'আপনার ওই বসার ঘরে যেতে পারব না।' সরকারি জায়গা দখল করে মোখলেশ ব্যাপারী যে ঘরটা তুলেছেন সেই ঘরটা দেখিয়ে ওসি সাহেব বললেন, 'ওই ঘরের চাবি তো আপনারে কাছে আছে?'

'ওই ঘরের চাবি দিয়ে কী হবে, স্যার?'

'ঘরটা খুলতে হবে।'

'ঘর খুলতে হবে কেন, স্যার! কোনো আসামী-টাসামী লুকিয়ে আছে নাকি ওই ঘরের ভেতর?' মোখলেশ ব্যাপারী চোখ বড় করে বললেন।

'না, কোনো আসামী লুকিয়ে নেই। একটা লাশ লুকানো আছে ঘরের ভেতর।' ওসি সাহেব ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন।

'লাশ! এটা কী বলছেন স্যার আপনি! লাশ লুকাবে কীভাবে। লাশ কি হাঁটা-চলা করতে পারে নাকি!'

'তা পারে না। তবে অন্য কেউ তো কাউকে লাশ বানিয়ে এখানে লুকিয়ে রাখতে পারে।' ওসি সাহেব মোখলেশ ব্যাপারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, পারে না?'

মোখলেশ ব্যাপারী আমতা আমতা করে বললেন, 'জি স্যার, তা পারে। কিন্তু স্যার এই কাজটা কে করল!'

'সেটা তো আপনার ভালো জানার কথা ব্যাপারী সাহেব। যেহেতু ঘরটা আপনার।' ওসি সাহেব ঘরটার দিকে আবার এগুতে লাগলেন।

ওসি সাহেবকে কিছুটা বাঁধা দেওয়ার ভঙ্গিতে মোখলেশ ব্যাপারী বললেন, 'আমার মনে হয় কেউ ইয়ার্কি-ফাজলামি করে আপনাকে ওই লাশ রাখার ইনফরমেশনটা দিয়েছে। ওখানে তো কারো লাশ রাখার কথা না। ঘর সবসময় তালা দিয়ে রাখা হয়। আসলে হয়েছে কি স্যার, টাকা-পয়সা একটু বেশি হওয়ায় এলাকার লোকজন ইদানীং অন্য নজরে দেখে আমাকে। আসেন স্যার, ওই ঘরের ভেতর লাশ-টাশ কিছু নেই, আমার বসার ঘরে বসে কিছু চা-পানি খাই, একটু আরাম-আয়েশ করি।'

'না, সেটা সম্ভব নয়। মন্ত্রণালয় থেকে খবর এসেছে, ভালো মতো সবকিছু ইনভেস্টিগেশন করে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।' ওসি সাহেব মোখলেশ ব্যাপারীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন, ঘরের চাবিটা দিন।'

ভীষণ অনিচ্ছা নিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করলেন মোখলেশ ব্যাপারী। ওসি সাহেবের হাতে দিয়ে চেহারাটা বিমর্ষ করে বললেন, 'স্যার, আপনি তো আমার সমন্ধে খুব ভালো করে জানেন। তাছাড়া–।' মাথা নিচু করে কথা বলছিলেন তিনি। মাথা উঁচু করে দেখেন ওসি সাহেব অনেকদূরে চলে গেছেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তালায় চাবি ঢোকাচ্ছেন।

মাঠের এক কোনায় চুপচাপ বসে আছে রন্টুরা। অনেকের মতো খুব আগ্রহ নিয়ে ওরা তাকিয়ে আছে মোখলেশ ব্যাপারীর ঘরের দিকে। ওদের দেখে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে, গতরাতে ওই ঘরের ভেতর ওরাই একটা লাশ লুকিয়ে রেখেছে।

সান্টু ফিসফিস করে বলল, 'আমার তো মনে হয় লাশটা ওই ঘরের ভেতর নেই।'

'তোর এ কথা মনে হলো কেন?' ইন্দ্র একটু রাগি স্বরে বলল, 'আমি নিজ হাতে মেঝে খুড়ে সেখানে লুকিয়ে রেখেছি।'

'না, আমরা লাশ লুকিয়ে রেখে আসার পর কারা যেন মুখে কালো কাপড় ওই ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তারা নিশ্চয় লাশটা তুলে কোথাও ফেলে দিয়েছে। মাঝখান দিয়ে ওসি আঙ্কেল বিরক্ত হয়ে মনে মনে গালাগালি করবেন।' সান্টু মন খারাপ করে বলল।

'এটা অবশ্য তুই ঠিকই বলেছিস।' রুপম সান্টুর দিকে তাকিয়ে বলল,

'ওই লোকগুলো ঘরের ভেতর গিয়ে নিশ্চয় ব্যাপারটা টের পেয়েছে, তারপর লাশটা তুলে কোথাও ফেলে দিয়েছে।'

'যদি তাই হয় তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।' চপল গলাটা গম্ভীর করে বলল, 'আমরা তো তাহলে হেরে যাব।'

থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'না, আমরা হারব না। লাশ যদি না-ই পাওয়া যায় তাহলে আমরা আরো কঠিন কিছু করব। যে করেই হোক ওই ঘরটা ওখান থেকে ভেঙে ফেলতে হবে, খেলার জায়গা করতে হবে আমাদের। ফাইনাল পরীক্ষার পর পাইলট স্কুলের সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট খেলা আছে। এ পর্যন্ত দুবার হেরেছি ওদের সঙ্গে। এবার হারলে হ্যাট্রিক হবে। তখন আর মুখ দেখানো যাবে না। আমাদের দেখলেই সবাই বলবে হারু পার্টি। লজ্জায় তখন সবার ঘরে বসে থাকতে হবে। আরো একটা কথা।' কথা থামিয়ে তপু আরো একদলা থুতু ফেলল। কিন্তু কথা শুরু করল না। সামনের দিকে তাকাল। ওর দেখাদেখি আর সবাইও তাকাল। ওসি আব্দুল হাই তরফদার নাকে রুমাল দিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন। পাশে আরো কয়েকজন পুলিশ, তারা মোখলেশ ব্যাপারীর দু হাত চেপে ধরে আছেন।

ফাঁকা একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন ওসি আব্দুল হাই তরফদার। অন্য পুলিশরা মোখলেশ ব্যাপারীর হাত চেপে ধরে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, মাথা নিচু করে আছেন তিনি। মাইকটটা মুখের সামনে নিলেন ওসি সাহেব। তারপর সবার উদ্দ্যেশে বললেন, 'হ্যাঁ, এই ঘরের মেঝের ভেতর একটা লাশ পেয়েছি আমরা। লাশটা অবশ্য এখনো চিনতে পারিনি আমরা। তবে মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা আরো কিছু জিনিস পেয়েছি। কী পেয়েছি-তদন্তের স্বার্থে আপাতত সেটা আর এখন বলতে চাচ্ছি না আমরা। তবে এটা বলতে চাই-জিনিসগুলো ভয়ঙ্কর। ব্যাপারী সাহেবকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। কিছু পুলিশ অবশ্য এখানে রয়ে যাবে ঘরটা পাহারা দেওয়ার জন্য, একটু পর আমরা আরো কিছু পুলিশ নিয়ে এখানে আবার ফিরে আসছি।' ওসি আব্দুল হাই তরফদার সামনের দিকে এগুতে লাগলেন, তার পেছনে পেছনে মোখলেশ ব্যাপারীর হাত চেপে ধরে অন্য পুলিশগুলোও এগুতে লাগলেন। তারপর পুলিশের গাড়িতে উঠে থানার দিকে চলে গেলেন সবাই।

রন্টু চোখ দুটো বড় করে বলল, 'মেঝেতে আমরা রাখলাম লাশ, কিন্তু ওখানে আরো কিছু নাকি পাওয়া গেছে! ওগুলো নাকি আবার ভয়ঙ্কর! জিনিসগুলো তী হতে পারে বলতো?'

'বুঝতে পারছি না।' ইন্দ্র চেহারাটা চিন্তাযুক্ত করে বলল, 'এতক্ষণ সেটাই ভাবছিলাম।'

'অ, ব্যাপারী তাহলে ওইসব খারাপ জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্যই ওই ঘরটা তৈরি করেছে!' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'খারাপ মানুষের খারাপ কাজ!'

সান্টু একটু এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু জিনিসগুলো কি তা না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, ইন্দ্রদের বাড়ির পাশে নদীতে যে এত লাশ ভেসে আসে ওটা ওই মোখলেশ ব্যাপারীর কাজ না তো?' রুপম সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমার তো মনে হচ্ছে তারই কাজ।' ইন্দ্র দাঁত কিড়মিড় করে বলে, 'খুব ভালো একটা শাস্তি হওয়া দরকার লোকটার।'

'ওই দেখ দেখ...।' রন্টুর কথা শুনে সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে, মোখলেশ ব্যাপারীর ছেলে মৃধা পুলিশকে চিৎকার করে কী যেন বলল, সঙ্গে সঙ্গে দুটো পুলিশ তাকে ধরার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। মৃধা দৌড়াচ্ছে, পেছনে পেছনে পুলিশ দুজনও দৌড়াচ্ছেন।

হাসতে হাসতে ছোট চাচা বাপ্পীর ঘরে ঢুকে বললেন, 'প্রথমেই তোর কাছে আমি স্যরি, এক্সট্রেমলি স্যরি।'

'কেন, চাচু?'

'তোর জন্মদিনে আসতে পারিনি বলে।'

'তুমি যে আসতে পারবে না সেটা তো আগেই বলেছ।' বাপ্পী মুখোশের মতো লাল জামাটা দেখিয়ে বলল, 'তোমার দেওয়া এই গিফটটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, চাচু।'

'সারাক্ষণ তাই পড়ে থাকিস, না?'

'সারাক্ষণ পড়ে থাকার আরো কিছু কারণ আছে চাচু। মুখোশের আড়ালে চেহারাটা ঢেকে থাকে বলে আমার মন ভালো আছে না খারাপ আছে সেটা কেউ টের পায় না।'

বাপ্পীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে চাচু বললেন, 'তোর মনটা কি এখন খারাপ?'

'সেটা তো বলব না, চাচু। তুমি বুঝে নাও।'

'তোর গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে মনটা খারাপই।' ছোট চাচা খাটের ওপর পা তুলে বসে বলেন, 'কিন্তু মনটা তো খারাপ থাকার কথা না তোর। জন্মদিনে নিশ্চয়ই খুব মজা করেছিস। তুই এ ফ্যামিলির বড় ছেলে না, প্রতিবছরই তো তোর জন্মদিনে অনেক মজা করা হয়।'

শাফিন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'মজা না ছাই হয়েছে। আব্বু-আম্মু তো এবার ভাইয়ার জন্মদিন কোনো কেকই আনেনি।'

'কেক আনেনি!' ছোট চাচু অবাক হয়ে বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটা কি বলছে রে শাফিন। তোর জন্মদিনে এবার কেক আনা হয়নি?'

'বাদ দাও তো, চাচু।' বাপ্পী গলার স্বরটা অন্যরকম করে বলে, 'জন্মদিনে কেক না আনলে কী হয়?'

'কী হয়, না হয়, সেটা পরের কথা। তাই বলে জন্মদিনে কেক আনা হবে না, এটা কোনো কথা হলো?' ছোট চাচু চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, 'তোদের এখান থেকে আমার অফিস দূরে হয় বলে আমি তোদের এখানে থাকি না, অফিসের কাছে বাসা নিয়েছি আমি। বাসায় থাকি না বলে কি সবকিছু উল্টে যাবে! ' ছোট চাচু খাট থেকে পা নামিয়ে বলেন, 'দাঁড়া, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

বাপ্পী খপ করে চাচুর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'প্লিজ চাচু, কেক নিয়ে কোনো কথা বলো না। আমি এমনিতেই খুব লজ্জার মধ্যে আছি। আব্বু-আম্মু আমার মুখ দেখতে চায় না, ঠিকমতো কথা বলতে চায় না আমার সঙ্গে, একসঙ্গে খেতে ডাকে না, আমার ভালো মন্দ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে না এখন। আমার খুব খারাপ লাগে চাচু। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয়, জানো? মনে হয় দূরে কোথাও পালিয়ে যাই, কিংবা চুপচাপ মরে যাই।'

শাফিন ছোট চাচুর কাছে গিয়ে একটা আঙ্গুল টেনে ধরে বলে, 'জানো চাচু, ভাইয়া আর এখন বাইরেও যায় না। স্কুলে যায়, আবার বাসায় এসেই ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে আমি

ওই জামাটা চাইলে ওটা আমাকে দেয়, একটু পর আবার ফিরিয়ে নিয়ে নিজে পরে নেয়। মাঝে মাঝে জামাটা পরে আমাকে অবশ্য ছাদে হাঁটতে নিয়ে যায়।'

চাচু বাপ্পীকে কিছুটা জড়িয়ে ধরার মতো করে ধরে বলেন, 'ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কী করিস তুই?'

'আমি জানি না, চাচু।'

'মনটা খারাপ হয়ে গেল রে!'

বাপ্পী অনেকক্ষণ চুপ থকে বলে, 'চাচু, আমি কি খুবই খারাপ একটা ছেলে? আমার মধ্যে ভালো কোনো কিছুই নেই? কান্না কি জিনিস আমি কখনো জানতাম না চাচু। এখন আমার একটু পরপরই কান্না পায়। শব্দ করে কাঁদতে পারি না, কিন্তু আমি চুপিচুপি সারাক্ষণ কাঁদি। কখনো কখনো এ কান্না আর শেষ হয় না আমার, চাচু।' বাপ্পী কথা বলছে আর কাঁদছে। ছোট চাচু হঠাৎ বাপ্পীর গালে ঠাস করে একটা থাপ্পর মেরে বলেন, 'একদম কাঁদবি না তুই। তুই জানিস না, তোর কান্না দেখলে মাথা ঠিক থাকে না আমার। যা আমার সামনে থেকে।' ছোট চাচু বাপ্পীকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। শাফিন অবাক হয়ে দেখে, সে নিজেও কাঁদছে।

১১.

সাত বছরের জেল হয়েছে মোখলেশ ব্যাপারীর। সরকারি জায়গা দখল করে তোলা ওই ঘরের ভেতর লাশটার সঙ্গে তিনটা বন্দুক, নব্বইটা ওই বন্দুকের গুলি, ছয়টা রাম দা, ছোট বড় আরো এগারটা ধারাল অস্ত্র পাওয়া গেছে। অনেক রকমের মাদকদ্রব্যও পাওয়া গেছে তিনটা বড় বড় কাঠের বাক্সের ভেতর। ব্যাপারী যে বড় মাদক ব্যবসায়ী ছিলেন আশপাশের কেউই সেটা টের পায়নি কখনো। সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা-একটা ডাকাত দল ছিল তার। তিনি নিজে কখনো ডাকাতি করতে যেতেন না, তবে তার দল বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ডাকাতি করে নিয়ে আসত। ধরা পড়ার কয়েকদিন আগে রসুলপুরের চৌধুরী বাড়িতে ডাকাতি করা হয়েছিল। তার মেয়ের বিয়ে ছিল, সোনা-দানা বিভিন্ন কিছু কেনা হয়েছিল। বিয়ের কয়েক ভরি সোনাও পাওয়া গেছে ওই ঘরের মেঝেতে একটা পলিথিনের ব্যাগে। ব্যাপারী গভীর রাতে বিভিন্ন লোককে মাঝে মাঝে চোখ বেধে এই ঘরে নিয়ে আসতেন এবং তাদের ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতেন।

ব্যাপারী জেলে যাওয়ার দুই মাস পর ঘরটা ভেঙে ফেলেছে এলাকার লোকজন। সব কিছু পরিষ্কার করে সেখানে খেলার মাঠ বানানো হয়েছে আবার। রন্টু আর তপু মিলে মাঠের এক কোনে মাটিতে ব্যাডমিন্টন খেলার দাগ কাটছে। রুপম, চপল, সান্টু মিলে তৈরি করছে ক্রিকেট খেলার মাঠ। আগে থেকেই কাজগুলো করে রাখছে ওরা, যাতে অন্য কেউ এখানে কোনো কিছু আবার করে না বসে। মাসখানেক পর ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার পর পাইলট স্কুলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা। ভালো করে প্রাকটিস করতে হবে এবার।

ইন্দ্র বাজারে গিয়েছিল খেলার মাঠের জন্য কিছু জিনিস কিনতে। ফিরে এসে বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে রে!'

রন্টু দাগ কাটা বাদ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মন খারাপের আবার কী হলো?'

'অনেকদিন পর বাপ্পীকে দেখলাম। আজ তো স্কুল বন্ধ, তবু বই হাতে কোথায় যেন যাচ্ছিল। এত করে ডাকলাম ফিরেই তাকাল না আমার দিকে। মনে হলো, আমার ডাক ওর কানে যায়নি। অথচ আমি বেশ চিৎকার করে ডেকেছি ওকে।'

'ইশ!' রুপম বেশ অপরাধী গলায় বলল, 'মোখলেশ ব্যাপারী, ঘর, খেলার মাঠ এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এতদিন ওর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। একবারও খোঁজ নেওয়া হয়নি ওর। এমনও তো হতে বড় একটা অসুখে পড়েছিল ও, যার জন্য আমাদেরও খোঁজ নিতে পারেনি।'

'তুই ঠিকই বলেছিস।' সান্টু রুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর খোঁজ নেওয়া হয়নি বলে ও বোধহয় আমাদের ওপর রাগ ও অভিমান দুটোই করেছে। যার জন্য ইন্দ্রর গলা শুনে সাড়া দেয়নি।'

'আমার তো মনে হয় ইন্দ্রকে ও দেখেছেও।' থু করে একদলা থুতু ফেলে তপু বলল, 'রাগ করেছে বলে এগিয়ে আসেনি ইন্দ্রর দিকে।'

'একটা কাজ করলে কেমন হয়?' চপল সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ বিকেলে আমরা সবাই মিলে বাপ্পীদের বাসায় যাব। ওর আব্বু-আম্মুর সঙ্গে এখনো আমাদের পরিচয় হয়নি তো কী হয়েছে! আমরা আজ পরিচিতি হবো। আমরা আজ বাপ্পীর সঙ্গে দেখা করেই আসব।'

রন্টু মাঠের ঘাস থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনটা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেল রে। কতদিন বাপ্পীকে দেখি না!'

সামনে বই মেলে বসে আছে বাপ্পী, কিন্তু পড়ছে না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে ওর। কারণ বিকেলে রন্টুরা এসেছিল, কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করেনি। শাফিনকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়েছে-বাসায় নেই ও।

সন্ধ্যার দিকে হাত-মুখ ধোওয়ার সময় বাথরুমের আয়নার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বাপ্পী। আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে দেখেছে সে আর মনে মনে কিছু কথা বলেছে। কথাগুলো সে নিজেকেই বলেছে। কথাগুলো বলার সময় সে কেঁদেছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল রন্টুদের কাছে ছুটে যাবে, কিন্তু নিজেকে থামিয়ে রেখেছে সে। না, রন্টুদের কাছে ও আর যাবে না, সম্ভবত কোনোদিনই যাবে না।

খটখট শব্দ হচ্ছে দরজায়। বাপ্পী আস্তে করে বলল, 'কে?'

'ভাইয়া, আমি।'

বাপ্পী উঠে এসে দরজা খুলে শাফিনকে দেখে বলল, 'কিছু বলবি?'

'তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।' শাফিন পকেট থেকে অনেকগুলো চকলেট বের করে বলল, 'এগুলো তোমার জন্য।'

চকলেটগুলো হাতে নিয়ে বাপ্পী বলল, 'এগুলো কে দিয়েছে?'

'আব্বু দিয়েছে।'

বাপ্পী খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দিয়েছে?'

'না, এগুলো আমার চকলেট। আব্বু তো বলেছে তোমাকে নাকি আর কখনো কোনো কিছু কিনে দেবে না, তোমার সঙ্গে কথাও বলবে না।' শাফিন একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বলে, 'আব্বু আরো একটা কথা বলেছে।'

শঙ্কিত গলায় বাপ্পী বলল, 'কী বলেছে?'

'তুমি আবার আব্বুকে বলে দিও না কিন্তু।'

'আব্বু তো আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমি বলে দিব কীভাবে?' বাপ্পী শাফিনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বল।'

শাফিন গলার স্বরটা একটু নিচু করে বলল, 'তোমার তো আর কয়দিন পর ফাইনাল পরীক্ষা। এবারও নাকি তুমি কয়েক সাবজেক্টে ফেইল করবে। তোমাকে নাকি তারপর আর বাসায় রাখবে না। কোনো হোস্টেলে নাকি রেখে আসবে তোমাকে।'

'আম্মু কি বলেছে?'

'আম্মুও তাই বলেছে।'

'আম্মুও তাই বলেছে!' চকলেটগুলো শাফিনকে ফেরত দিয়ে বাপ্পী বলল, 'তুই এখন যা, আমি এখন চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকব।'

'পরীক্ষায় তিন সাবজেক্টে ফেইল করার পর সেই যে তুমি তিন চার মাস ধরে একা একা, দরজা জানালা বন্ধ করে, চুপচাপ বসে থাকো, কী করো তুমি ঘরের ভেতর? যখন স্কুলে যাওয়ার সময় তখন কেবল বাইরে বের হও, তারপর স্কুল থেকে বাসায় এসেই আবার সেই ঘরের ভেতর। তোমার খারাপ লাগে না, ভাইয়া?'

'তুই এখন যা, আমার ভালো লাগছে না।'

'চকলেট নিলে না?'

বাপ্পী ছলছল চোখে বলল, 'চকলেটগুলো তো আমার জন্য আনেনি, তোর জন্য এনেছে। তুই খেয়ে নিস।'

'ভাইয়া-।' শাফিন বাপ্পীর একটা আঙ্গুল টেনে ধরে বলল, 'তোমাকে যদি হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব। তোমাকে ছাড়া আমার ভালো লাগবে না, ভাইয়া।'

বাপ্পী কিছু বলে না, শাফিনের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসে। বইটা এখনো খোলা, সেদিকে না তাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় ও। শাফিন এগিয়ে এসে বাপ্পীর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'ভাইয়া, আব্বুর রুমের বারান্দায় টবে একটা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ।'

'কী যেন নাম?'

'জারবেরা।'

'ফুল ফুটেছে গাছটায়। যা সুন্দর ফুল না!' শাফিন বাপ্পীর হাত টেনে ধরে বলে, 'চলো, দেখি আসি।'

'আব্বু-আম্মু আমার মুখই দেখতে চায় না, আব্বুর ঘরের ভেতর কীভাবে যাব বল?'

'ওই জামাটা পরে চলো।'

'না। সবসময় ওটা পরতে ভালো লাগে না রে।' বাপ্পী খুব করুণ স্বরে বলে, 'দেখিস, একদিন দূরে কোথাও পালিয়ে যাব।'

'কোথায় পালিয়ে যাবি?' ছোট চাচু দ্রুত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'কোথাও পালাতে হবে না। কয়দিন পর তোর ফাইনাল পরীক্ষা, আমার মনে

হয় এবার তোর রেজাল্ট ভালো হবে। শোন-।' চাচু তার ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে বলেন, 'অনেকদিন ধরে তুই আমার কাছে একটা মোবাইল চাচ্ছিস। তোর জন্মদিনে তো কিছু দিতে পারিনি। এই মোবাইলটা তোর জন্য। তোর কোনো কিছু করতে হবে না। আমিই মাঝে মাঝে ফ্লেক্সি করে টাকা পাঠিয়ে দেব।' ছোট চাচু বাপ্পীকে কিছুটা জড়িয়ে ধরার মতো করে বলেন, 'একটা শর্ত আছে আমার।'

'চাচ্চু-।' বাপ্পী একটু থেমে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'সম্ভবত আমি জানি তোমার শর্তটা কি?'

১২.

দেড় মাস পর খেলার মাঠে এসেছে রন্টুরা। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। রেজাল্টও দিয়ে দেবে দু-এক দিনের মধ্যে। বাপ্পীদের স্কুলের রেজাল্ট অবশ্য আজকে দেবে। ওদের স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টের দিন একটা অনুষ্ঠান হয়। সব ছাত্র-ছাত্রীর বাবা-মাকে ইনভাইট করা হয় সেদিন। প্রত্যেক ক্লাসে যে ফার্স্ট হয় তাকে মঞ্চে ডেকে একটা গিফট, একটা ক্রেস্ট আর একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সঙ্গে তাদের বাবা-মাকেও মঞ্চে ডাকা হয়। সে কীভাবে ফার্স্ট হলো সেই বিষয়ে একটা বক্তব্যও দিতে হয় প্রত্যেককে।

ব্যাডমিন্টন কোর্টে বেশ কিছু ঘাস গজিয়েছে। সান্টু টেনে টেনে সেগুলো তুলছিল। হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন কয়টা বাজে?'

ওদের মধ্যে কেবল তপুই হাতে ঘড়ি পরে। তপু ওর হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাড়ে তিনটা।'

'বাপ্পীদের স্কুলের রেজাল্টের অনুষ্ঠান তো পাঁচটায় শুরু হবে। অনেকদিন বাপ্পীকে দেখি না। চল, আমরা আজ ওর স্কুলে যাব। এতে ওর সঙ্গে দেখাও হবে, রেজাল্টও জানা যাবে ওর।'

'খুবই ভালো আইডিয়া।' রুপম কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'বাপ্পীর স্কুলে গিয়ে প্রথমেই আমরা ওর সঙ্গে দেখা করব না। আগে কিছুক্ষণ ওর আশপাশে থেকে লক্ষ্য করব ওকে। দেখব, ও আসলে কেমন আছে। তারপর আমরা সবাই মলে ওকে জাপটে ধরব।'

'ইচ্ছেমতো কিল-ঘুষিও মারব।' ইন্দ্র কিছুটা রাগী গলায় বলল, 'ওর যাই হোক একবারের জন্য হলেও তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারত।'

'আমার কাছে সেটাই আশ্চর্য লেগেছে।' চপল ভীষণ মন খারাপ করে বলল, 'কাল রাতে ওকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন দেখেছিস?' রন্টু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দেখেছি-একটা রেললাইন ধরে বাপ্পী হেঁটে যাচ্ছে, আমরা ওর পেছনে পেছনে দৌড়ে ওকে ধরার চেষ্টা করছি, কিন্তু ধরতে পারছি না। এক সময় দেখি একটা ট্রেন আসছে উল্টো দিক থেকে। আমরা চিৎকার করে বলছি, বাপ্পী ট্রেন, তুই সরে দাঁড়া। কিন্তু ও আমাদের কথা শুনলই না। একসময় ট্রেনটা ওর ওপর দিয়ে উঠে গেল। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ট্রেনটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, বাপ্পী আগের মতোই হেঁটে যাচ্ছে, কিছুই হয়নি ওর।'

'অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।' ইন্দ্র বেশ উৎসাহী হয়ে বলে, 'কয়েকমাস আগে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম না, ওই যে শ্মশানে দাদু বসে আমাকে ডাকছে। মাঝ রাতেই আমি শ্মশানে গেলাম, লোকটার সঙ্গে কথা হলো। আমি এগিয়ে যেতেই পালিয়ে গেল সে। আমার মনে হয় ওটা মোখলেশ ব্যাপারীর ডাকাত দলের কেউ ছিল। আমরা অনেক সময়ই অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি।'

'চল, তাহলে আর দেরি করার দরকার নেই। আর মাত্র এক ঘণ্টা পরেই বাপ্পীদের স্কুলের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে।' রন্টু সবাইকে তাড়া দিয়ে বলল, 'বাপ্পী কেক খেতে খুব পছন্দ করে, চল ওর জন্য একটা কেক কিনে নিয়ে যাই।'

বাপ্পীর আব্বু শাহরিয়ার সাহেব বাপ্পীর আম্মুকে বললেন, 'বাপ্পীর স্কুলের অনুষ্ঠানে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, তুমি একাই যাও।'

'তুমি না গেলে আমি যাই কীভাবে!'

'গিয়ে কী হবে বলো? তোমার ছেলে এবারও কয়েক সাবজেক্টে ফেইল করবে। ওরকম ফেইল করা ছেলের স্কুলে যেতে ভালো লাগে না।' শাহরিয়ার সাহেব বারান্দায় গিয়ে পেপার পড়া শুরু করলেন।

বাপ্পীর আম্মুও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বেশ কিছুক্ষণ শাহরিয়ার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'হেড মাস্টার সাহেব তো বন্ধু মানুষ। সকালে তোমাকে ফোন করে ইনভাইট করলেন না।'

'আমি জানি তো কেন আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে। তোমার ছেলের কীর্তি নিয়ে কিছু কথা শোনাবে আমাকে। এটা ডেকে নিয়ে এক ধরনের অপমান করা। তোমার ছেলের জন্য আমি অপমানিত হতে পারব না। তোমার যেতে ইচ্ছে হলে তুমি যাও, আমি যাব না।'

'সবার বাবা-মা যাবে, আর আমরা যাব না?'

'সবার বাবা-মা তো ছেলে-মেয়েদের ভালো রেজাল্টের জন্য যাবে, গিয়ে তারা আনন্দ পাবে। আর আমরা যাব মন খারাপ করার জন্য, ছেলের ফেইলের খবর শোনার জন্য। তাও একটা সাবজেক্টের না, কয়েক সাবজেক্টে ফেইল।' শাহরিয়ার সাহেব বেশ বিরক্ত নিয়ে বললেন, 'আমার সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে তোমার ওই ফেল্টুস ছেলেটা।'

'ফেইল করার পর ছেলেটার সঙ্গে আমরা তেমন ভালো করে কথাই বলিনি, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাইনি, একসঙ্গে বসে খাইওনি। ছেলেটা একা একা ঘরে ভেতর বসে থেকেছে। স্কুল আর বাসা, কোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও মিশতে দেখিনি এ কয়েকমাস। তুমি যাই বলে, বাপ্পী তো আমাদেরই ছেলে!' বাপ্পীর আস্‌সু কান্না কান্না গলায় বললেন, 'সারাক্ষণ ছেলেটা মুখ ঢেকে কী একটা সংয়ের জামা পরে থাকে। ওর চেহারাই তো ভুলে গেছি আমরা। তুমি চলো, ছেলেটাকে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থেকে শাহরিয়ার সাহেব বললেন, 'চলো। তবে আমাকে কোনো দিন ওই ফেল্টুস ছেলের স্কুলের যেতে বলবে না। মান-সম্মান অনেক নষ্ট করেছি, আর না।'

দুটো চিঠি নিয়ে বাপ্পীদের স্কুলের পিয়ন মোবারক আলী হেডস্যারের রুমে ঢুকে বলল, 'স্যার, দুটো চিঠি আছে আপনার।

মোবারকের হাত থেকে চিঠি দুটো নিয়ে প্রথম চিঠিটা খুলে ফেললেন তিনি। একটু পরে রেজাল্টের অনুষ্ঠানটা শুরু হবে। চিঠিটা তাই দ্রুত পড়তে লাগলেন। কিন্তু সেটা পড়তে পড়তে কপাল কুঁচকে ফেললেন তিনি। শেষ করার পর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তার। দ্বিতীয় চিঠিটা আর না খুলে বের হলেন তিনি রুম থেকে। অনুষ্ঠানের মঞ্চেতে উঠে সামনের সবার দিকে তাকালেন। কোনো চেয়ার খালি নেই, মানুষজন সব এসে গেছে। হেডস্যার

ভালো করে আবার সবার দিকে তাকিয়ে মাউথপিসের সামনে গিয়ে বললেন, 'আমরা সাধারণত ক্লাস ওয়ান থেকে রেজাল্ট ঘোষণা শুরু করি। কিন্তু পূর্বের নিয়ম ভঙ্গ করে আজ আমরা ক্লাস সেভেনের রেজাল্টটা আগে ঘোষণা করব। তার আগে দুটো কথা বলব আমি।'

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলে ফেললেন হেডস্যার। সেটা মাউথপিসের সামনের টেবিলটাতে রেখে তিনি বললেন, 'একটু আগে দুটো চিঠি পেয়েছি আমি। একটা চিঠি আমাকে লেখা হয়েছে। ওই চিঠিটাতে লেখা আছে আমি যেন।' হেডস্যার দ্বিতীয় চিঠিটা টেবিল থেকে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'এই চিঠিটা সবাইকে পড়ে শোনাই, খুব অনুরোধ করে চিঠিটা লিখেছে সে। সাধারণত ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত যারা ফার্স্ট হয় তাদের প্রত্যেককে এখানে এসে কীভাবে পড়ে ফার্স্ট হলো তা বলতে হয়। এই চিঠিটা যে লিখেছে ক্লাস সেভেনে এবার ফার্স্ট হয়েছে সে। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানে সে আসেনি, তার বদলে এই চিঠিটা লিখেছে। আমি খুব আনন্দ নিয়ে বলছি ক্লাস সেভেনে এবার ফার্স্ট হয়েছে-।' হেডস্যার আবার সামনের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ সেভাবেই তাকিয়ে থেকে হাসতে হাসতে বললেন, 'ক্লাস সেভেনে এবার ফার্স্ট হয়েছে, রেকর্ড মার্কস পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে মোঃ মুশফিকুর রহমান, আমরা যাকে ডাকি বাপ্পী বলে।'

মঞ্চের সামনের তৃতীয় সারিতে বাপ্পীর আব্বু আর আম্মু বসেছেন। হেডস্যারের কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন তারা। পেছনের দিকে অনেকগুলো ছাত্রের মাঝে রন্টুরা দাঁড়িয়ে আছে। বাপ্পী ফার্স্ট হওয়ার কথা শুনে ছোট্ট করে একটা চিৎকার দিল ইন্দ্র। সান্টু ফিসফিস করে বলল, 'বাপ্পী ফার্স্ট হয়েছে, আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।' রন্টু বলল, 'ওর জন্য অনেক বড় একটা কেক কিনব আমি।' চপল কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হেডস্যার মাউথপিসটা এক হাত দিয়ে ধরে বললেন, 'বাপ্পী যেহেতু ফার্স্ট হয়েছে সেহেতু ওর আজ এখানে এসে কীভাবে ফার্স্ট হলো তা বলার কথা। কিন্তু ও আজ স্কুলে আসেনি বলে এই চিঠিটা লিখেছে। আমি এখন চিঠিটা সবাইকে পড়ে শোনাব-

> ঘাসফুল গাঢ় নীল রঙের হয়, গত সাড়ে পাঁচ মাস আমি সেই ঘাসফুল দেখিনি, এমনকি ঘাসও দেখিনি। অথচ ঘরের পাশেই

একগুচ্ছ ঘাস আছে আমার, সবুজ, চোখ জুড়ানো সবুজ ঘাস। দিনের আকাশ যেমন সুন্দর, রাতের আকাশও। হঠাৎ ছিটকে পড়া উল্কা, হঠাৎ একটু বেশি জ্বলজ্বল করা কোনো তারা, পুডিংয়ের মতো টসটসে পূর্ণিমাময় চাঁদ, সেগুলোও দেখিনি আমি এতদিন। খুব কাছেই একটা নদী আছে আমাদের, নদীর পানি তিরতির করে বয়ে চলে আর গান গায়, খুব আপন করে কান পাতলে সেই গান শোনা যায়, সেই গান শোনা হয়নি নদীর পাড়ে কান পেতে। দাদুর ঘরের কার্নিশে যে চড়ুইগুলো প্রতিদিন ঝগড়া করে, প্রতিদিন একটু একটু করে কুটো এনে ঘরে বাঁধে, সেই চড়ুই দেখা হয়নি চোখ মেলে।

স্কুলে আসার পথে একটা বড় বট গাছ আছে। কতদিন বটের ছায়ায় বসে গল্প করেছি, গরমে ভিজে ওঠা গা শুকিয়েছি। সেই ছায়ার কথা প্রায় ভুলেই গেছি। আমার বন্ধু সান্টুদের পুরনো বাড়ির ছাদে এক জোড়া দোয়েল বাসা বেঁধেছে, ডিম দিয়েছে, সম্ভবত এতদিনে বাচ্চা ফুটিয়ে সেই বাচ্চা উড়েও চলে গেছে। খুব শখ ছিল ওই বাচ্চাগুলো একটু আদর করব, সেই আদর করা হয়নি। চার রাস্তার মোড়ে যে অন্ধ ফকিরটা বসে, মাঝে মাঝে থাকে ভালো কিছু খাবার কিনে দিতাম, এ কয়দিন তাকে খাবার কিনে দেওয়া হয়নি। রন্টুদের গরুর বাচ্চা লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়াত, কাছে দাঁড়ালেই গা ঘসত, কখনো কখনো জিভ দিয়ে হাত চেটে দিত, বাছুরটা গলার নিচে চুলকিয়ে দেওয়া হয়নি বহুদিন।

আমার আর এখন প্রজাপতি দেখা হয় না, সকালে উঠে ঘাসের ডগার শিশির দেখা হয় না, বৃষ্টিতে ভেজা হয় না দু হাত মেলে, রংধনুর রংগুলো আর অবাক করে না আমাকে।

আমার সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত কাটে এখন পড়ার টেবিলে। নিজের স্বপ্ন ভুলে গেছি অন্যের স্বপ্ন পূরণ করার জন্যে। আমার চোখে এখন আর পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্য ভেসে ওঠে না, বইয়ের কালো কালো অক্ষরগুলো প্রতিনিয়ত লাফিয়ে বেড়ায় চোখের মণিতে। তিন সাবজেক্টে ফেইল করা এই আমার মুখটা বাবা-মা দেখতে চান না বলে আমি এখন মুখোশ-জামা পড়ে থাকি ইচ্ছে করেই।

পৃথিবীর সব আনন্দ বিসর্জন দিয়ে আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি। সম্ভবত আগামীতেও হবো। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারও হবো হয়তো একদিন। কিন্তু আমার সোনা ঝরা শৈশব কে আমাকে ফিরিয়ে দেবে? হাইব্রিড প্রাণীর মতোই কি আমার জীবনটা কেটে যাবে? কোথায় পাব স্বর্গ-ছোঁয়া মায়ের কোল? নদী, পাখি, ঘাস, ঘাসফুল,

বটের ছায়া? সব পাখি উড়ে বেড়ায়, অন্যকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কিছু পাখি থাকে খাঁচায় বন্দি। আমিও বন্দি, অন্যকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমার সমস্ত স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে বন্দি! স্রষ্টার কাছে আমি প্রতিদিন কাঁদি আর বলি-প্রতিটা শিশু মানুষের মতো বড় হোক, অ্যাকুরিয়ামে রাখা মাছের মতো নয়!

চিঠিটা পড়া শেষ করে ভাঁজ করলেন হেডস্যার। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে তিনি সামনের দিকে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নিচু করে ফেললেন মাথা। কিন্তু তার আগেই সবাই টের পেয়ে গেছে-হেডস্যার কাঁদছেন, শৈশব না পেরোনো এক কিশোরের কষ্টে কাঁদছেন!

পড়ার টেবিলের ওপর রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল বাপ্পীর। ছোট চাচু নতুন মোবাইল কিনে দিয়েছেন। বেশ আনন্দ নিয়ে সেটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ছোট চাচু কিছুটা শব্দ করে বলেন, 'কিরে, একেবারে ভয়ঙ্কর একটা কাজ করে ফেলেছিস! আমি জানতাম তুই এরকম একটা কিছু করবি। আমি জানি আমাদের বাপ্পী খুবই ভয়ঙ্কর, সে ইচ্ছা করলেই যেকোনো কাজ করতে পারে, আগামীতেও পারবে। কী পারবি না?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বাপ্পী, কিছু বলে না। ছোট চাচু একটু তাড়া দিয়ে বলেন, 'কিরে, কিছু বলছিস না কেন?'

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বাপ্পী বলল, 'পারব।'

'গুড, ভেরি গুড।' ছোট চাচু খুব আনন্দ নিয়ে বলেন।

গলাটা করুণ করে বাপ্পী বলল, 'কিন্তু চাচ্চু, আমার এই শৈশব ফিরিয়ে দেবে কে? গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা নামে যে খেলাগুলো আছে ওগুলো তো হারিয়ে যাচ্ছে, ওগুলো খেলবে কে? স্কুল শুরু হওয়ার আগে হাত উঁচু করে আমরা যে প্রতিদিন প্রতিজ্ঞা করি-সঠিকভাবে দেশকে গড়ে তুলব আমরা, দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসব আমরা। কে, কবে কেবল লেখাপড়া করে দেশকে গড়ে তুলতে পেরেছে, দেশকে ভালোবাসতে পেরেছে? আমরা এখন যারা বড় হচ্ছি তারা কেবল পিঠে এক বস্তা বই বহন করেই বড় হচ্ছি। ওই বই বহন করতে করতে যে কুঁজো হয়ে যাচ্ছি, বড় হয়েও আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। চাচ্চু, আমরা লেখাপড়াও করতে চাই, লেজ দোলানো

দোয়েলও দেখতে চাই। আমরা পূর্ণিমা রাতে আনন্দ করে চাঁদের আলো দেখতে চাই, আবার প্রয়োজনের সময় সারা রাত ভরে পড়তেও চাই। আমরা যদি নদীর ধারে না যাই তাহলে সাঁতার নামক শব্দটা যে একদিন হারিয়ে যাবে। আমরা যদি ক্রিকেট না খেলি তাহলে জাতীয় দলে একদিন খেলবে কারা, আমরা যদি দৌড়-ঝাঁপ না করি তাহলে অলিম্পিকে সোনা জিতে আনবে কারা? প্রতিবছর দেশে এতো ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার তৈরি হচ্ছে, কই একজন বিল গেটস তো তৈরি হচ্ছে না, যে বিল গেটস হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তার কোর্স কমপ্লিট করতে পারেননি। নিউটন কতটুকু লেখাপড়া করেছেন, কতটুকু লেখাপড়া করেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ? পুথিগত বিদ্যার বাইরেও আরো অনেক বিদ্যা আছে চাচ্চু! আমরা কতটুকু সেই বিদ্যা শিখতে পারছি? তোমরা বড়রা তোমাদের স্বপ্ন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছো, কিন্তু আমাদেরও যে কিছু স্বপ্ন আছে সেটার কথা ভুলে যাচ্ছো!' বাপ্পী হঠাৎ ওর ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে ওর আব্বু-আম্মু দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। দ্রুত সে টেবিল থেকে মুখোশ-জামাটা নিয়ে গায়ে চাপিয়ে চাচ্চুকে বলে, 'চাচ্চু, এখন রাখি।'

লাইনটা কেটে দিয়ে মোবাইলটা আগের জায়গায় রেখে দেয় বাপ্পী। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর অগোছালো বইগুলো গুছাতে থাকে সে। পেছন থেকে হঠাৎ আম্মু এসে বুকের সঙ্গে মাথাটা চেপে ধরে শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। টান দিয়ে জামাটা খুলে ফেলে বাপ্পীর মুখটাতে হাত বুলাতে থাকেন। তারপর ওর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কান্নাজড়ানো স্বরে বলেন, 'আই অ্যাম স্যরি, বাবা। উই আর স্যরি।'

বাপ্পী মুখোশ-জামাটা আবার পরে নিয়ে খুব শান্ত গলায় বলে, 'আম্মু, ক্লাস এইটের বইগুলো যোগাড় করে ফেলেছি। এখনই সবকিছু রেডি করতে হবে, পড়া শুরু করতে হবে। না হলে তো ফার্স্ট হতে পারব না, আম্মু!'

'না, তোর ফার্স্ট হতে হবে না।' আম্মু চিৎকার করে ওঠেন।

'হবে আম্মু। সারাজীবন তো এভাবে মুখোশ-জামা পরে থাকতে পারব না, আম্মু। তোমরা আমার মুখ দেখতে চাও না, কিন্তু আমার তো মুখোশ-জামা পরতে ইচ্ছে করে না আর। আমার তো তোমাদের সঙ্গে বসে খেতে ইচ্ছে করে আম্মু, বেড়াতে ইচ্ছে করে, হেসে হেসে কথা বলতে ইচ্ছে করে,

গল্প শুনতে ইচ্ছে করে। এর জন্য আমাকে ফার্স্ট হতে হবে, আম্মু। আম্মু।' খুব কষ্ট করে এতক্ষণ কান্না থামিয়ে রেখেছিল বাপ্পী। শব্দ করে হঠাৎ কেঁদে উঠে বলে, 'কতদিন তুমি আমাকে আমার সাদা মগে দুধ বানিয়ে দাও না! তোমাদের অনেক কিছুর সঙ্গে তোমার হাতে বানানো সেই দুধের স্বাদও ভুলে গেছি! আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি যে মাঝে মাঝে গল্প করতে ভুলে গেছি সেটাও। আম্মু-।' বাপ্পী একটু থেমে বলে, 'তুমি কি শেষবারের মতো আমাকে একটু জড়িয়ে ধরবে!'

দু হাত বাড়িয়ে বাপ্পী পাশ ফিরে তাকায়। চোখের পানিতে ভেসে গেছে মায়ের সমস্ত মুখ। মা কাঁদছেই, কাঁপা কাঁপা হাতে বাপ্পীর বাড়িয়ে দেওয়া হাত দুটে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।

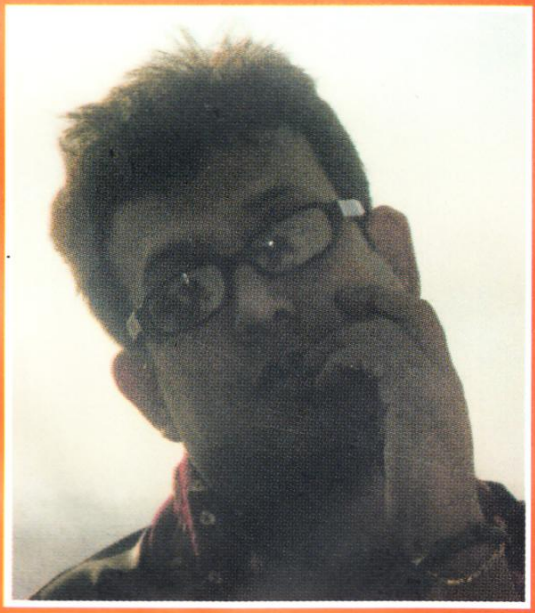

কেউ কেউ বলেন, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে যারা স্বপ্নপূরণের পথে এগোয়, তারা ক্রমে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ আর স্বার্থপর। এই কথাগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে হাজার ব্যস্ততার মাঝেও সুমন্ত ঠিক ঠিক হাজির হয় আমাদের নিজস্ব আড্ডার জগৎ 'জলছায়া'তে। বুড়ো বটগাছের শরীরজুড়ানো ছায়ায় ক্লান্তি মুছে নিতে নিতে শোনে জীবনের গল্প, শোনায়ও। আমরা যখন নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে মেলাতে ক্লান্ত, তখন অসহায় ও বঞ্চিতদের জন্য কিছু একটা করার তাগিদে সুমন্ত গড়ে তোলে–'কৃষ্টিক'। এভাবে স্বপ্নপূরণের পথে আরেক ধাপ এগোয় ও। আর আমরা ওর পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত হই, সেই সঙ্গে গর্বিতও।

একা একা বসে থাকা, একা একা হেঁটে বেড়ানো, একা একা চুপচাপ ভাবতে থাকা সুমন্ত সবার জন্য ভাবে–সবার জন্য। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্যটি থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ অপরিচিত অনাত্মীয়ও বাদ যায় না তার ভাবনার ব্যপ্তি থেকে। তার বন্ধুত্ব আর সহযোগিতার হাত ঠিক ঠিক পৌঁছে যায় যেখানে প্রয়োজন সেখানে। আর দিন শেষে তার প্রাপ্তির ঝুলিতে জমা হয় ভালোবাসা–অসংখ্য মানুষের সীমাহীন ভালোবাসা।

এ সকল ভালোবাসা আর শুভকামনাগুলো সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে একসময় নিজের ঘরে ফেরে সুমন্ত। আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মেটাবে বলে হাতে তুলে নেয় কাগজ কলম। তার অভিজ্ঞতা, অনুভব আর মতামতগুলো তুলে ধরে গল্প–উপন্যাসে। সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর আমরা অংশীদার হই তার সেইসব অনুভবের। আমাদের মুগ্ধতার প্রতিউত্তরে কেবল একটু মিষ্টি করে হাসে সুমন্ত। সেই অলৌকিক ব্যাখ্যাতীত হাসিতে আমাদের আরও বেশি মুগ্ধ করে সে ফিরে যায় নিজের জগতে–যেখানে ওর উপস্থিতিতে মুখ তুলে চায় দুটো গোল্ডফিশ, টিউটিউ ডেকে ওঠে ঘরের কোনে বাসা বাঁধা দুটো চড়ুই। সুমন্ত যে ওদেরও একজন, খুব কাছের একজন।

–কাছের বন্ধুরা